বাতায়ন

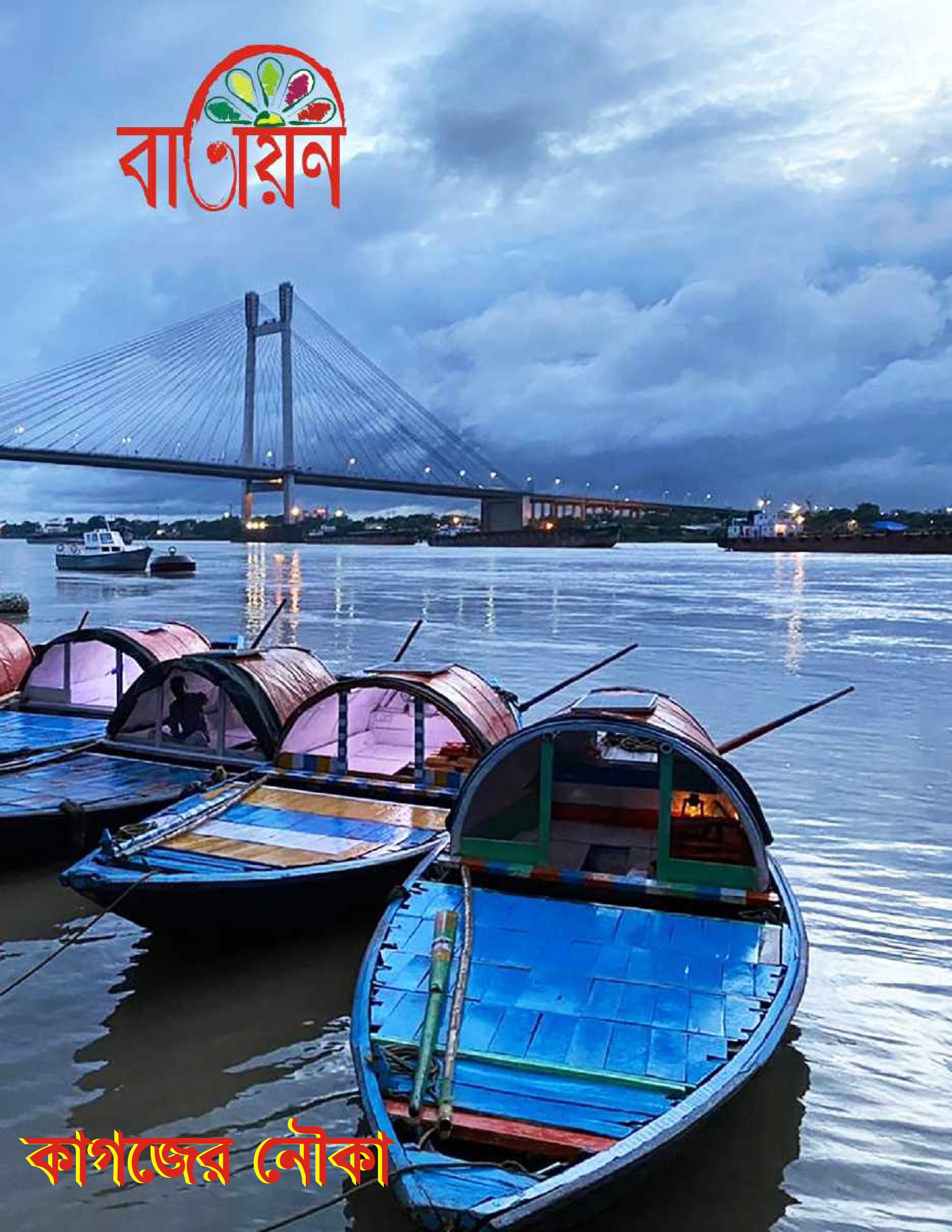

কাগজের নৌকা

Partha
2018

কাগজের নৌকা

ত্রয়োদশ সংখ্যা, আগস্ট ২০২০

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

Issue Number 13 : August 2020

Editors

Manas Ghosh, Kagajer Nauka
Ranjita Chattopadhyay
Jill Charles (English Section)

Coordinator

Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication

Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design and Art Layout

Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support

Susanta Nandi, India

Published By

BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production

Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Tridib Kr. Chatterjee লকডাউনে গঙ্গার ধারে : Front Cover

Tridib Kr. Chatterjee — Editor, Kishore Bharati — Managing Director, Patra Bharati Group of Publications — Hony. President, Publishers & Booksellers Guild.

Partha Pratim Ghosh Painting : Inside Front Cover

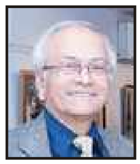

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

Mousumi Roy বেনারসে গঙ্গার ঘাট : Title Page

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

Ranjita Chattopadhyay Carribian Sea : Back Cover

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় — শিকাগোর বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষিকা। আর নেশায় পড়ুয়া। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত। রঞ্জিতার প্রেম হল বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর মাঝে মাঝে কিছু লেখালিখি। রঞ্জিতা 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদিকা। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার বিভিন্ন 'লিটল ম্যাগাজিনে' ওনার লেখা বের হচ্ছে। শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত। সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে — ''Bugging Cancer'' আর ''Three Daughters Three Journeys''। সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার।

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

সুধী,

দেখতে দেখতে অনেকগুলো মাস কেটে গেল। আমরা কি ধীরে ধীরে নব্য স্বাভাবিকে (new normal) অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি? বাতায়নের লেখক এবং পাঠকের মূল যোগাযোগটা যেহেতু ইন্টারনেটবাহিত, তাই বলা যেতে পারে আমরা হয়তো একটু এগিয়ে থেকেই শুরু করেছিলাম। এই লকডাউনে সময়ের দাবী বুঝে, বাতায়ন অনুরাগীদের জন্য বেশ কয়েকটি মনোজ্ঞ এবং তারকাখচিত ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার জন্য প্রযোজক, পরিচালকমন্ডলী এবং দুর্দান্ত উপস্থাপনার জন্য বালার্ক ব্যানার্জিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই।

ধন্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে আরো এরকম অনুষ্ঠানের প্রত্যাশাও রইল সমস্ত বাতায়নপ্রেমীদের পক্ষ থেকে।

বাতায়নের বাৎসরিক সংকলন ২০২০ প্রকাশনার পথে। একমাত্র এই ইস্যুটিই হাতে ছুঁয়ে দেখা যায়, পাওয়া যায় নতুন বইয়ের গন্ধ, তাই আমার মতো অনেকেই সারাবছর অপেক্ষায় থাকি। এবারের সংকলনটি অন্যন্য হয়ে উঠতে চলেছে স্বয়ং কবি শ্রীজাত'র সম্পাদনার গুণে। বইটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত পেলে সেগুলি প্রকাশিত হবে বাতায়নের পরবর্তী সংখ্যায়।

এবার আসি বাতায়নের 'কাগজের নৌকা'র কথায়। জনপ্রিয়তা বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে আমাদের দায়িত্বও। আমরা পাঠকদের একের পর এক সেরা ধারাবাহিক উপহার দেওয়ার চেষ্টা করছি। হটাবাহার শেষ হতে না হতেই শুরু হয়ে গেছে শকুন্তলা চৌধুরীর টানটান উপন্যাস 'পরবাসী'। শুরু থেকেই জনপ্রিয় 'চা ঘর' আর দুর্বার 'সময়ে'র উপাখ্যান তো ছিলই, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রাক্তন সেনাকর্মীর স্মৃতিকথা 'উলুখাগড়ার দিনলিপি'। এ সংখ্যায় আছে মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটবেলার গল্প, এর সঙ্গে উপরিপাওনা তাঁর কন্যারচিত 'পিতৃপরিচয়'।

নিয়মিত আকর্ষণের মধ্যে আছে পুষ্পা সাক্সেনা রচিত গল্পের শ্রীসুজয় দত্ত কৃত সাবলীল অনুবাদ, রম্যরচনায় পারিজাত ব্যানার্জীর জাদুকলম আর মৌসুমী রায়ের সুখপাঠ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত। এছাড়া উদ্দালক ভরদ্বাজ কৃত বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ তো কাগজের নৌকার একটি বড় সম্পদ। সঙ্গে রইল বাতায়ন পাঠকদের অত্যন্ত প্রিয় কবি সঞ্জয় চক্রবর্তী ও পলাশ বর্মনের কবিতা। ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, শেষ হয়ে এল কবি পল্লব বরণ পালের সনেট গুচ্ছ'র সিরিজ।

এই সংখ্যায় শেষ হল রজত ভট্টাচার্য্যের দুর্দান্ত রহস্য গল্প অভিজ্ঞান-মালতী-২। যাঁরা আগের এপিসোড পড়তে পারেননি তাঁরা বাতায়নের ওয়েবসাইটে গিয়ে খুব সহজেই উল্টে দেখতে পারেন বাতায়ন বা কাগজের নৌকার অন্যান্য সংখ্যাগুলি।

ভাইরাসের তান্ডবে আবদ্ধ জীবন... একে একে বহু মানুষের অকালে চলে যাওয়া... এবারে বর্ষার সঙ্গীতেও যেন কানে এসে বাজে বিষাদের সুর... তবুও তো বেঁচে থাকাটুকু... এ দুর্বিপাকে নিদারুন পাওয়া... কবিতায়, গানে, পাঠে... আসুন পূর্ণ করি আমাদের এই অমূল্য আয়ু!

আন্তরিক ভালোবাসা সহ

মানস ঘোষ
সম্পাদক
বাতায়নের কাগজের নৌকা

সূচীপত্র

ধারাবাহিক

চা-ঘর	রমা জোয়ারদার	৫
সময়	সৌমিত্র চক্রবর্তী	১০
পরবাসী	শকুন্তলা চৌধুরী	১৫
উলুখাগড়ার দিনলিপি – যুদ্ধ-সহযোদ্ধা-জীবনমরণ	প্রশান্ত চ্যাটার্জী	২১
সনেটগুচ্ছ	পল্লববরন পাল	২৫

গল্প, রম্যরচনা ও অন্যান্য

অভিজ্ঞান-মালতী	রজত ভট্টাচার্য	২৬
চার দেওয়ালের বেড়া	পারিজাত ব্যানার্জী	৩৭
একাকী গুলজার	সঞ্জয় চক্রবর্তী	৩৮
প্রবাসী পাখির গান	পলাশ বর্মন	৩৯
স্মৃতি	পলাশ বর্মন	৩৯
‘‘জীবইন্যা, উর্জা সেন ও আমি’’	মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০
বাবা	মৌসুমী ব্যানার্জী	৪৩

অনুবাদ

ভিসওয়াভা শিম্বরস্কা	উদ্দালক ভরদ্বাজ	৪৬
উদাস রং	পুষ্পা সাক্সেনা (অনুবাদ সুজয় দত্ত)	৫৫

ভ্রমণ

বেনারসের ডায়রি	মৌসুমী রায়	৬৫

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ৮

[পূর্ব কথাঃ – জ্বর জারির কারণে জিতেন দাসের শরীরটা খারাপ হওয়ায় সে আর নিয়মিত চা-ঘরে আসতে পারছিল না। এই অবস্থায় দোকানের টাকা পয়সা সামলানো, প্রয়োজন মত বাজার হাট করা, এসবের দায়িত্ব সে রঘুকে দিল। বিকেলের দিকে কখনও কখনও সে দোকানে আসে। আর জিতেন না পারলে তার এক ভাগ্নে এসে দোকানে বসে। রঘু তখন ক্যাশের হিসেব তাকে বুঝিয়ে দিয়ে নিজের টিউশন ক্লাসে পড়তে যায়।

একদিন বিকেলে মাস্টার মশায়ের বাড়ির কাছে রঘুর সাথে বকুলের দেখা হয়ে গেল। এতদিন বাদে দেখা হওয়ায় দুজনেই উচ্ছ্বসিত ! বকুল তাকে চা খাওয়াতে একটা রেস্তোঁরায় নিয়ে গেল। ওখানে বসে বকুল তার কলকাতার জীবনের সব লড়াই, এবং অবশেষে, একটা চাকরি পাবার কথা রঘুকে বলল ! বকুলের সাথে এ ভাবে রেস্টুরেন্টে আসার এই নতুন অভিজ্ঞতা রঘুকে এক নতুন অনুভূতির জগতে নিয়ে গেল !]

সেদিন সকাল বেলাতেই চা-ঘরে একেবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড ! সত্যি বলতে কি, শুধু আজ বলে নয়, ইদানিং, মানে, বিরজু আসার পর থেকে, প্রায়ই চা-ঘরে ছোট খাট লড়াই ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। এরজন্য শুধু বিরজুকে দায়ী করা যায় না ! এটা অবশ্য ঠিক যে বিরজু একটু গোঁয়ার গোছের আছে ! চট করে রেগে যায়, আর তেড়ে-মেড়ে মারতে যায়। ঝগড়াটা ওর লাগে বাদলের সাথে। বিরজুর একটু মোটা সোটা চেহারা। কাজে কর্মে তেমন চটপটে নয়। চালাক চতুরও নয়। তবে সে খাটতে পারে। আর যতই ভারি কাজ হোক, কোনোটাতে না নেই তার। অন্যদিকে বাদল রোগা-পটকা, তিড়িং বিড়িং লাফিয়ে লাফিয়ে কাজ করে। খুবই চটপটে, আর একেবারে যাকে বলে মিচকে শয়তান! সুযোগ পেলেই সে বিরজুর পিছন লাগে। ওকে খেপিয়ে দিয়ে বাদল দারুণ মজা পায়।

সেদিন সকালের দিকে বিরজু বড় একটা গামলায় আটা মাখছিল। পাশ থেকে বাদল এসে আধ মাখা আটার একটা বড় দলা তুলে নিল। বিরজু একটু বিরক্ত ভাবে ভুরু কুঁচকে তাকালো। কিন্তু কিছু বলল না। গামলাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বাদলের দিকে পেছন ফিরে নিজের কাজ করতে লাগল। বাদল আটার দলাটা দিয়ে বেশ নাদুস নুদুস, ভুরিদার একটা মানুষের চেহারা বানালো। তারপর সেটাকে সুন্দর করে রুটি বেলার জায়গায় সাজিয়ে রেখে মিটিমিটি হাসতে লাগলো। নিত্যানন্দ ওটা দেখে জিজ্ঞাসা করল – 'ওটা কি বানিয়েছিস, বাদল ?'

বাদল মুখে কিছু বলল না। মিচকি হেসে, বুড়ো আঙ্গুল তুলে বিরজুর দিকে ইশারা করল। নিত্যানন্দ, মুরারী সব হো, হো করে হাসতে লাগল। বিরজু সন্দিহান হয়ে আটার পুতুলটা দেখল, তারপর রান্নাঘরের সবার দিকে তাকাল। বাদল বলল – 'কি রে, তোর মূর্তিটা পছন্দ হয়েছে ?'

বিরজু রাগে বেলুনের মত ফুলে উঠল। আটা মাখা হাতেই বাদলের দিকে তেড়ে এল। কিন্তু বাদল ততক্ষণে তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে একবারে পিছন দরজা দিয়ে বাইরে। বিরজুও পিছন পিছন দৌড়াল। কলতলার চারপাশে একটা চক্কর মেরে বাদল আবার দৌড়ে পিছন দরজা দিয়েই দোকানে ঢুকল। সেই সময় স্টোর থেকে এক ক্রেট ডিম নিয়ে নিত্যানন্দ রান্নাঘরে যাচ্ছিল। বাদলের সাথে জোর এক ধাক্কা লাগল ওর। ডিমের ক্রেটটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে সমস্ত ডিম একেবারে ভেঙে ছত্রখান হল!

প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে বাদল থেমে গেল। নিত্যানন্দ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। বাদলের পিছন পিছন তেড়ে আসছিল বিরজু, সেও দাঁড়িয়ে পড়েছে। রান্নাঘর থেকে মুরারী আর ক্যাশ টেবিল ছেড়ে রঘুও দৌড়ে এল। ভাঙা ডিমগুলোর দিকে তাকিয়ে রঘু বলল – 'এটা কি হল ?'

মুরারী বলে উঠল – 'সর্বনাশ! এতগুলো ডিম!'

– 'তিরিশটা ডিম!' রঘু গম্ভীর ভাবে বলল। 'এই লোকসান এখন কে ভরবে ?' নিত্যানন্দ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই রঘু বাদলের দিকে তাকালো। বাদল অপরাধী মুখে মাথা নীচু করে নিল।

– 'বাদল, সামনের মাসে তোর মাইনে থেকে এই ডিমের দাম কেটে নেওয়া হবে!' রঘু বলে দিল।

চমকে মুখ তুলে কাঁদো কাঁদো মুখে বাদল বলল – 'সে তো অনেক টাকা !'

– 'হ্যাঁ, একশ আশি টাকা। কিছু করার নেই। তুই ভেঙেছিস, তোকেই দাম দিতে হবে ।'

– 'আমি কি ইচ্ছে করে ভেঙেছি নাকি?'

এবার নিত্যানন্দ রাগত স্বরে বলল – 'তুই-ই তো পিছন থেকে এসে আমায় ধাক্কা দিলি !'

– 'সে তো বিরজু আমার পিছনে তাড়া করছিল, তাই !'

এবার বিরজু তীব্র প্রতিবাদ করল – 'হামি কুছু করিনি !'

রঘু হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বলল – 'ঠিক আছে। এখন এসব থাক। দাদু যখন দোকানে আসবে, তখন দাদুকে সব বলব। তারপর দাদু যা বলবে তাই হবে। এখন যে যার কাজে যাও।'

মুরারী ব্যাস্ত হয়ে বলল 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, খরিদ্দার আসার সময়। নিতাইদা ঘরটা পরিস্কার করে ফেল। এ্যাই বাদলা, চটপট হাত লাগা। বাঁদরামি করে অকাজ করেছিস, এখন দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে? বিরজু এদিকে আয়। আটা মাখা শেষ কর। অনেক কাজ এখন ।'

সবাই যে যার কাজে লেগে গেল। একটু বাদে বাদল এসে রঘুর সামনে দাঁড়াল। রঘু জিজ্ঞাসা করল – 'আবার কি হল?'

শুকনো মুখে বাদল বলল – 'তুমি বরং সামনের মাসে আমার টাকাটা কেটে নিও। কিন্তু দাদুকে এসব কথা বলে দিও না ।'

রঘু একটু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল – 'কেন বলতো ?'

মাথা চুলকে একটু কিন্তু কিন্তু করে বাদল উত্তর দেয় – 'সব শুনে দাদু যদি আমায় তাড়িয়ে দেয় ? কাজটা না থাকলে আমার চলবে না রঘুদা। দাদা আজকাল আর প্রতি মাসে ঠিকঠাক মত আমাদের খরচা দেয়না । কাজ না থাকলে আমি আর মা খাবো কি ?'

একটুক্ষণ চুপ থেকে রঘু বলে – 'ঠিক আছে। যা এখন। চিন্তা করিস না ! দেখছি, কি করা যায় !' বাদল চলে যাচ্ছিল ! রঘু আবার ডেকে বলল – 'আর শোন, ফিচলেমিটা এখন থেকে একটু কম করিস !' কথাটা বলতে গিয়ে আটার পুতুলের চেহারাটা মনে করে রঘু হেসে ফেলল। এইবার বাদলের মুখটাও দুষ্টু হাসিতে ভরে উঠল।

ওদিকে রান্নাঘরে মুরারী নিত্যানন্দকে বলছিল – 'দেখেছ নিতাইদা, রঘু আজকাল কেমন ওস্তাদ হয়েছে ! কথা বলার কি কায়দা, যেন ওই মনিব ! আমি এই চা-ঘরের সবচেয়ে পুরনো লোক। কিন্তু আমি কখনও এরকম ব্যবহার করি ? রঘু তো মোটে এই সেদিন এসেছে। বাবুর নেক-নজরে আছে কিনা, তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করুছে। চেনেনা তো এখনও দুনিয়াটাকে ! আরে বাবা মালিক আর চাকর কখনো এক হয় না। আমি ওর অনেক আগে থেকে চিনি এই জিতেন দাসকে!'

নিতাই কারোকেই চটাতে চায় না। তাই চুপচাপ মুরারীর কথা শুনে যায়। পাকোড়ার তেল গ্যাসে বসিয়ে দিয়ে মুরারী বলে – 'বুঝলে নিতাইদা, তখন চা-ঘর একটা ছোট্ট দোকান ছিল। টিনের চাল, কয়লার উনুন। খদ্দেরদের বসবার জন্য বাইরে দুটো বেঞ্চি পাতা থাকত ! একেবারে শুরুতে অবশ্য আমি ছিলাম না। সুখেনদাকে নিয়ে বাবু, মানে এই জিতেন দাস

দোকানটা শুরু করে। প্রথমে শুধু লেড়ে বিস্কুট আর চা – এই পাওয়া যেত। তখন কালিচকের বাজারটাও এখনকার মত এমন জমজমাট ছিল না। রেস্টুরেন্টগুলো তো একটাও ছিল না তখন ! সামনের রাস্তাটা অনেক সরু ছিল ! এত গাড়ি-বাস যেত না, কিন্তু কিছু কিছু গাড়ি-টাড়ি তো যেত ! আশ-পাশের মধ্যে চায়ের দোকান এই একটাই ছিল! তাই পথ-চলতি মানুষ আর স্থানীয় লোকজন চা খেতে বা আড্ডা দিতে এখানেই আসত! বাবুর ব্যবহার ভালো, কথাবার্তা কইতে জানে, লোকেরা পছন্দ করত। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই চায়ের সাথে ডিম, পাউরুটি এসবেরও ব্যবস্থা হয়ে গেল। সেই সময় আমি এই দোকানে রান্নার কাজে সুখেনদাকে সাহায্য করার জন্য ঢুকলাম। তখন পর্যন্ত এই দোকানের কোনো নামও ছিল না। আমি ঢোকার পরাই এই দোকানের বিক্রি-বাটা হু-হু করে বাড়তে লাগল!'

– 'কিন্তু সুখেনদা কই গেল?' সব্জি কাটা বন্ধ রেখে হাঁ করে গল্প শুনতে শুনতে নিতাই হঠাৎ প্রশ্ন করে।

কড়াইয়ের তেল গরম হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দফার পাকোড়া ভাজা শুরু করে মুরারী বলল – 'সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড !' নিত্যানন্দর হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বলল – 'হাতের কাজ বন্ধ কোরো না। সব্জি গুলো কাটতে থাক ! হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সুখেনদা একদিন টাকা চুরি করতে গিয়ে একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ল ! বাবু বলল – তুই পুরনো লোক তাই তোকে পুলিশে দিলাম না। কিন্তু এই দোকান থেকে তুই এখনই বেরিয়ে যা ! সুখেনদা অনেক হাতে পায়ে ধরল। কিন্তু বাবুর ওই এক কথা। ব্যাস সুখেনদার কাজ খতম হয়ে গেল। সেই থেকে আমি এই দোকানের রান্নার লোক। যাকে বলে কুক !' দারুণ একটা হাসিতে মুরারীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

নিতাই যেন একেবারে দম বন্ধ করে গল্প শুনছিল। মুরারী কথা থামাতে বলে উঠল – 'বাপরে কী কাণ্ড !' ভাজা পকোড়াগুলো তেল ছেঁকে তুলতে তুলতে মুরারী আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলল – 'বুঝলে নিতাইদা, সেই থেকে এই মুরারীর হাতের চা, ডিম-পাউরুটি এমন বিখ্যাত হয়ে গেল যে জিতেন দাসের দোকান একেবারে রম-রমিয়ে চলতে লাগল ! লোকের মুখে মুখে দোকানের নাম হয়ে গেল চা-ঘর। দু-চার বছর যেতে না যেতেই দোকানের একেবারে ভোল পাল্টে গেল। শুরুর সেই চায়ের দোকান আর আজকের এই চা-ঘর যে একই – সেটা ভাবাই যায় না ! শুরু থেকেই তো আমি আছি। আর আমার পরে পরেই এসেছিল বিল্টু। রঘু এসেছে তার অনেক পরে। ওকে তো আমিই মানুষ করলাম। যখন এসেছিল নিজের প্যান্টের বোতামটাও ঠিক করে লাগাতে পারত না। কাজ কর্ম তো বাদই দাও। কিছুই পারত না। আমিই তো সব শিখিয়েছি। আর এখন দ্যাখ, আমাদের উপরেই ও ছড়ি ঘোরাচ্ছে !'

বাদল এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল – 'মুরারীদা, এক প্লেট পকোড়া আর দুটো চা।' বাদলকে দেখে মুরারী নতুন উদ্যমে বলে ওঠে – 'এই যে আজ ডিম ভাঙার জন্য ও বাদলের মাইনের টাকা কেটে নেবে বলল, সেটা কি উচিত হল ?' কথা থামিয়ে মুরারী ওদের দুজনের মুখের দিকে তাকাল। ওদের কারো মুখেই কথা নেই। দুজনেই ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মুরারীর দিকে। মুরারী পকোড়ার থালাটা দেখিয়ে বাদলকে প্লেটে সাজাতে ইঙ্গিত করে নিতাইকে বলল – 'ওই গ্যাসে চা বসিয়ে দাও, নিতাইদা !'

নির্দেশ দেওয়া শেষ করে মুরারী আবার পুরনো কথায় ফিরে গেল, 'না, মানে, উপায় তো আরো অনেক আছে, তাই না ? অত সাধুগিরি দেখানোর কি আছে ? দু চারটে পাকোড়ার দাম চেপে গেলেই তো ডিমের দাম উঠে আসে। কিন্তু তা তো করবে না রঘু ! তাহলে তো মালিকের কাছে ভালো মানুষী করা হবে না ! বুঝছ না তোমরা, রঘু তো বাবুকে এটাই দেখাতে চায় যে ও কত বিশ্বাসী, ও মনিবের লাভ লোকসানের দিকে কত খেয়াল রাখে !'

দ্বিতীয় দফায় পকোড়া ভাজা হচ্ছে। নিতাই মাথা নেড়ে মুরারীর কথায় সায় দিয়ে বলল – "তা অবশ্য ঠিকই !" বাদল চোখ গোল গোল করে এতক্ষণ মুরারীর কথা শুনছিল। কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে এবার ট্রেতে পকোড়া, টমেটো সস্, দুটো চা – সব সাজিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরে একটু নিরিবিলি সময় দেখে বাদল রঘুর কাছে গিয়ে বলল, 'রঘুদা, একটা কথা বলব ?' রঘু বাদলের দিকে

তাকাতেই বাদল বলতে শুরু করল – 'না, মানে বলছিলাম কি, আমার ডিম ভাঙার টাকাটা তুমি যদি কয়েক প্লেট পাকোড়ার থেকে নিয়ে নাও তো কেমন হয় ?'

রঘু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল – 'তার মানে ?'

– 'মানে, তুমি যদি কয়েক প্লেট খাবারের দাম দাদুকে হিসেবে না দেখাও, তাহলেই তো ভাঙা ডিমের দামটা উঠে আসবে ! তাই না ?'

রঘুর মুখ চোখ গম্ভীর হয়ে যায় । বাদলের চোখে চোখ রেখে বলে – 'আমাকে চুরি করতে বলছিস ?'

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে চোখ নামিয়ে বলে – 'এটাকে কি চুরি বলে ? কটা বা টাকা ! দাদুর কাছে ওটা কিছুই না । অথচ আমার জন্য ওইটুকুই অনেক ! আমার জন্য এইটুকু করতে পারবে না রঘুদা ?'

রঘু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল – 'না, পারবো না । কেন পারবো না, তার অনেকগুলো কারণ আছে । জানিস বাদল, অনেক দিন আগে মাস্টার মশাই একটা গল্প বলেছিলেন । গল্পটা অনেক বড় । পুরোটা বলতে সময় লাগবে । আমি তোকে সংক্ষেপে আসল কথাটা বলছি ।' রঘু বলতে শুরু করল ।

কোনো এক শহরে একজন ব্যবসায়ী ছিল । সে চালের ব্যবসা করত । গজানন নামে তার একজন খুব বিশ্বাসী কর্মচারী ছিল । ব্যবসায়ীটি অনেক ব্যাপারে তার উপরে নির্ভর করত । গুদামের একটা চাবি গজাননের কাছে থাকত । মাল আনা, এদিকে সেদিকে পাঠানো, এসব কাজ সাধারণত গজাননের তদারকিতেই হত । সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল । কিন্তু একদিন একটা সমস্যা হল । ওখানে আরো কিছু লোক কাজ করত । তার মধ্যে একজন ছিল যতীন । সে গজাননকে সাহায্য করত । অল্পবয়সী, হাসিখুশি যতীন কাজে-কর্মেও ভালো ছিল । গজানন তাকে খুব পছন্দ করত । সেই যতীন একদিন রাতে গজাননের কাছে এসে কেঁদে পড়ল । বলল, ওর খুব বিপদ । তক্ষুণি সাত হাজার টাকা দরকার । নাহলে ওর ভাইকে বাঁচাতে পারবে না । ওর ভাইকে জুয়ার আড্ডা থেকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে ।

গজানন যতীনকে বুদ্ধি দিল, সব কথা মালিক কে বলে তার সাহায্য নিতে । কিন্তু যতীন তাতে রাজী হল না । বলল – 'এসব শুনলে মালিক আমাকেও চাকরি থেকে বের করে দেবেন । উনি তো আর বুঝবেন না যে, আমার ভাই আসলে কিছুই করেনি । অন্যদের দোষে ধরা পড়েছে !' যতীন বলল – 'গজাদা, তুমি যদি কিছু না কর তো আমাদের দুজনকেই মরতে হবে । তুমি তো জান, পৃথিবীতে ওই ভাইটা ছাড়া আমার আর কেউ নেই ।

গজানন তো ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ল । এত টাকা কী করে জোগাড় করবে ? তাও আবার এক রাতের মধ্যে! ও যখন আকাশ পাতাল ভাবছে, তখন যতীনই ওকে বলল – 'এত কি ভাবছ গজাদা ? উপায় তো তোমার হাতের কাছেই আছে । গুদাম থেকে কয়েক বস্তা চাল বার করে দাও । আমি ওটা বিক্রি করে কাল সকালের মধ্যে টাকা নিয়ে আসব !'

গজানন আঁতকে উঠল ! – 'কি বলছিস কি তুই? এ তো বিশ্বাসঘাতকতা! মালিক আমাকে বিশ্বাস করে গুদামের চাবি দিয়েছে, আর আমি এভাবে চুরি করব ?' চোখ মুছতে মুছতে যতীন অভিমানী গলায় বলল – 'তুমি শুধু ওনার দিকটাই দেখলে, আমাদের কথা ভাবলে না ! ওইটুকু লোকসানে ওনার মত লোকের কিছুই আসবে যাবে না । অথচ ওটুকুতে আমাদের জীবন বাঁচতে পারে !'

– 'হ্যাঁ, কিন্তু - - -'

গজাননকে থামিয়ে দিয়ে যতীন বলল – 'এতে কোনো কিন্তু নেই । গুদামের পিছনের দিকে যে পুরনো চালের বস্তাগুলো আছে, সেখান থেকে কয়েকটা সরিয়ে নিলে মালিক টেরও পাবে না । কদিন বাদে তো ওগুলোতে এমনিই পোকা ধরে যাবে!'

যা' হোক, এরকম অনেক কথাবার্তার পর যতীনের ভাইকে বাঁচানোর জন্য গজানন গুদাম থেকে কয়েক বস্তা চাল বার করে দিল ! এই ব্যাপারটা ওরা দুজন ছাড়া আরো একজন জানতে পারল । সে হল স্টোরের পাহারাদার । কিছুদিন পর ওই

পাহারাদার, তার পরিবারের বিরাট এক সমস্যা নিয়ে গজাননের কাছে এল। সে তার বোনের বিয়ের সময় নিজেদের বসত বাড়ি বন্ধক রেখে মহাজনের কাছে টাকা ধার করেছিল। এখন গত কয়েকমাস ধরে সে নানা কারণে সুদের টাকাটা দিতে পারেনি। ফলে মহাজন বলেছে যে সাতদিনের মধ্যে সুদের টাকা না দিলে তাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে ! পাহারাদার কেঁদে ফেলল – 'বাড়ি থেকে বের করে দিলে, বউ-বাচ্চা, বুড়ো মা-বাবাকে নিয়ে কোথায় যাব ?'

সব শুনে দুঃখিতভাবে গজানন বলল – "খুবই চিন্তার কথা। তুমি একবার মালিকের কাছে যাও। সব শুনে উনি নিশ্চই কিছু সাহায্য করবেন।" দারোয়ান রাজী হল না, বলল – 'উনি আর কি করবেন।! কিছু টাকা অগ্রিম দেবেন, তার পর মাসে মাসে মাইনে থেকে সেই টাকা কেটে নেবেন। এই মাইনে থেকে টাকা কাটলে আমি খাবো কি ? আর খাওয়াবোই বা কি ? তার চেয়ে তুমি যতীনের বেলায় যা করেছ, আমার বেলাতেও তাই কর। কয়েক বস্তা চাল বার করে দাও। আমি মহাজনের সুদ মিটিয়ে শান্তি পাই।'

এরকম একটা অন্যায় কাজ করতে গজানন প্রথমে আদৌ রাজী হয়নি। দারোয়ানকে অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কিছু লাভ হল না। সে বলল – 'তুমি যদি গুদাম থেকে মাল বার করে না দাও তো আমি মালিককে গিয়ে বলব তুমি স্টোর থেকে মাল সরাচ্ছ !'

পাহারাদারের কথা শুনে গজাননের পায়ের তলার মাটি সরে গেল। তার মনে হল, সে যেন ধীরে ধীরে চোরা বালির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। করুণ ভাবে সে বলল, কিন্তু আমি তো নিজের জন্য কিছু নিইনি। দারোয়ান বলল – 'সেসব কে শুনবে ? চাবি তোমার কাছে; স্টোরের দায়িত্ব তোমার উপর। কাজেই মালের কিছু গোলমাল হলে তোমাকেই ধরবে!' কেঁপে উঠল গজানন। শেষ পর্যন্ত চোর বদনাম ! ভয় পেয়ে পাহারাদারকেও সে চালের বস্তা বের করে দিল। এভাবে ক্রমশঃ আরো লোক ব্যাপারটা জানতে পারল এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও গজানন বারবার চালের বস্তা সরাতে বাধ্য হল ! কিছুদিনের মধ্যে মালিক, অর্থাৎ সেই ব্যবসায়ীও জেনে গেল যে, স্টোর থেকে মাল চুরি হচ্ছে। তারপর যা হবার তাই হল। গজাননের শাস্তি হল। পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল।

গল্প শেষ হল। দুজনেই চুপ। একটু পরে রঘু বলল – 'এবার বুঝলি তো বাদল, কেন আমি হিসেবের গণ্ডগোলের মধ্যে যাবো না ?' বাদল উত্তর দিল না। রঘুই আবার বলল – 'ওটা যে শুধু অন্যায় হবে, তাই নয় ! ওটা করতে গিয়ে আমারও একটা বড়সড় বিপদ হতে পারে। তাই আমি ওপথে যাবো না।'

বাদল মুখ নীচু করে বসেছিল। এবারও কোনও কথা না বলে চুপ-চাপ উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। রঘু জানে, বাদল নিজের বুদ্ধিতে তাকে এসব কথা বলতে আসেনি। পিছনের কলকাঠি যে মুরারী নাড়ছে, সেটাও রঘু বুঝতে পারে। আর তাইতেই তার মন খারাপ হয়ে যায় ! রঘু ভাবে, মুরারীদা আর আগের মত নেই ! রঘূর উপর তো সব সময় চটে থাকে। ভালো করে কথাও বলে না ! অথচ সত্যি বলতে কি এই মুরারীদাই তো তাকে ছোটবেলায় দেখাশোনা করত।

রঘুর এখনো মনে পড়ে, প্রথম দিকে প্রায় দিনই সে সন্ধ্যের পর একেবারে ন্যাতা হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। সেই দিনগুলোতে ওই মুরারীদাই তাকে ঘুম থেকে তুলে রাতের খাবার খাইয়ে দিত। সে সব কথা কি রঘু কখনো ভুলতে পারে ! রঘু আপন মনে বলে ওঠে – 'আসলে ওই মেয়েটা, ওই বিজলী! ওর জন্যই তো যত গন্ডগোল শুরু হল ! সেই ঝড়-বৃষ্টির রাতটার পর থেকেই মুরারী রঘুর সাথে এই রকম ব্যবহার শুরু করেছে ! রঘুর সব রাগ গিয়ে পড়ল বিজলীর উপর!'

(চলবে)

রমা জোয়ারদার — দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ৮

রবিবার। সকাল ৬টা। ছুটির দিন বলেই বোধহয় এখনও আলস্য জড়িয়ে শুয়ে আছে পাইকপাড়া। অন্যদিন হলে এতক্ষণে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যেত এই অঞ্চলটার। বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার তাড়া, গানশেল ফ্যাক্টরির কর্মচারীদের ঠিক সময়ে পৌঁছনোর ব্যস্ততা ইত্যাদি মিলিয়ে বেশ তটস্থ হয়ে ওঠে সকালটা। আজ কারও তাড়া নেই তেমন, এমনকি কাগজওয়ালারাও একটু দেরিতে ঢোকে পাড়ায় আজকের দিনে, দেখছে শিঞ্জিনী। একটু আগেই তার ঘুম ভেঙেছে। রবিবার সবার ছুটি হলেও সূর্যদেবের কর্তব্য পালনে কোনও খামতি নেই। ঠিক সময়ে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তিনি শিঞ্জিনীকে ডেকে দিয়েছেন। এখন বিছানার উপর চুপ করে বসে আছে সে। তার পরনে সাদা রঙের মাক্সি, সাদা শিঞ্জিনির প্রিয় রঙ। সে কোনও তীব্র রঙ সহ্য করতে পারে না। তার দুচোখের তলায় জলের শুকনো দাগ। ভোররাতে কেঁদেছে শিঞ্জিনী। স্বপ্ন দেখছিল সে, যদিও স্বপ্নটা এখন তার আর স্পষ্ট মনে নেই, তবু প্রায়ই এমন হয়। আজ শিঞ্জিনীর মনটা অন্যরকম। খুব বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করছে। আজ এমনিতে বন্ধুদের সঙ্গে অপর্ণাদের বাড়িতে সারাদিন কাটানোর কথা। পিকনিক করবে তারা, ঠিক করা আছে। অপর্ণাদের বিশাল বাড়ি, যেতে বেশ ভালো লাগে শিঞ্জিনীর। কিন্তু আজ একটুও ইচ্ছা করছে না ওখানে যেতে। তার আজ ইচ্ছা করছে অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে। একা একা। একটু বসে ভাবল শিঞ্জিনী, তারপর স্থির করল যে সে আজ তাই যাবে। কিন্তু কোথায় যাবে? সে রাস্তায় বেরিয়ে ঠিক করা যাবে'খন। কিন্তু আগে অপর্ণাকে আগে কাটানোর দরকার। অপর্ণাকে একটা মিথ্যা দরকারের কথা বলে যাওয়াটা কাটানো শক্ত হবেনা শিঞ্জিনীর পক্ষে। কারণ, অপর্ণা শিঞ্জিনীকে মোটেই পছন্দ করেনা। কি এক অজানা কারণে শিঞ্জিনীকে বেশ অবজ্ঞা করে সে। নেহাত বন্ধুদের দলে ডাকতে হয় বলে ডাকে। শিঞ্জিনী অবশ্য তেমন গা করেনা ব্যাপারটায়, সে অত বড় বাড়িটায় যেতে ভালবাসে, যদিও আজ যাবেনা।

যত দ্রুত সম্ভব, তৈরি হয়ে নিল শিঞ্জিনী, তারপর বি টি রোডের উপর এসে দাঁড়ালো। উমা কোনও প্রশ্নই করেননি, ধরেই নিয়েছেন যে সে বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছে। একটা ধর্মতলাগামী মিনিবাস এসে দাঁড়ালো। শিঞ্জিনী উঠে পড়ল বাসটাতে। আগে ধর্মতলা অবধি তো যাওয়া যাক, ভাবল সে। হুহু করে বাস চলছে রবিবার ভোর ছুঁয়ে, আজ আবহাওয়াটা বেশ মনোরম। দেখতে দেখতে শ্যামবাজার এসে গেলো। বেশ কিছু মানুষ উঠল এখানে। আর শিঞ্জিনীকে চরম বিস্মিত করে বাসে উঠে এলো সেই ছেলেটা – নীল। নীল খেয়ালই করেনি তাকে, গায়ে একটা সাদা জামা, হাতাটা গোটানো, বুকের বোতাম খোলা, নীল জিন্স আর চটিতে খুব ভালো দেখতে লাগছে নীলকে। হাতে তার একটা মস্ত চটের ব্যাগ যা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ ভারী। সেই ভারী ব্যাগ কোনওরকমে সামলাতে সামলাতে নীল এসে বসলো তারই পাশের সিটটাতে। এতক্ষণে তাকে খেয়াল করলো নীল আর ঝকঝকে হাসিতে বলে উঠলো, "আরে! আপনি! কোথায় যাচ্ছেন এতো সকালে ?"

নীলের চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বিবশ হয়ে গেল শিঞ্জিনী। একটা অদ্ভুত উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি আছে ছেলেটার চোখে, দেখলেই মনে হয় কোনও ঘরছাড়া বাউলের চোখ। শিঞ্জিনী অনুভব করল নীলের চোখ থেকে হাসিটা মুছে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, একটা মুগ্ধতা ভর করছে সে চোখ দুটোতে। তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নীল। নিজেকে সামলাতে সামলাতে সে বলে ওঠে, "না, তেমন কোথাও নয়, জানেন, এমনিই বেরিয়ে পড়েছি, কোথায় যাব ঠিক জানিনা।"

"খুব সুন্দর !", নীল বলে ওঠে হঠাৎ।

"কি ?" অবাক হয়ে শিঞ্জিনী প্রশ্ন করে।

"আপনার চোখ দুটো। জানেন, আজ আপনাকে দেখতে বেশ লাগছে", সরল বালকের কণ্ঠে নীল বলে ওঠে। তারপরেই যেন সম্বিত ফিরে পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে বলে, "সে কি ! কোথায় যাবেন, তাই জানেন না ? ভারী মজা তো ! তাহলে বরং আমার সঙ্গে চলুন।"

হঠাৎ এ'হেন প্রস্তাবে শিঞ্জিনী অবাক হয়ে যায়। "কোথায় যাবেন আপনি" ? সে জানতে চায়।

"আমি ? আরে, আমি যাচ্ছি ফলতার এক গ্রামে, সেখানে এক সাধুবাবা আশ্রম করে থাকেন। একলাই থাকেন। ভারী চমৎকার পরিবেশ জানেন, গঙ্গার ধারে, ঠিক তপোবন ধরনের ব্যাপার। উনি ওখানে থাকেন আর আশেপাশের গ্রামের লোকেদের নানা উপকার করেন। একটা দাতব্য চিকিৎসালয় চালান উনি ওখানে। আমার সঙ্গে ওনার প্রায় বছর খানেকের আলাপ। আমি মাঝে মাঝে অনেকের বাড়ি থেকে ব্যবহার না হওয়া ঔষধ সংগ্রহ করে দিয়ে আসি ওনাকে। যাচ্ছেন তো, দেখবেন, মানুষটা খুব ভালো"।

বেশ মজা লাগে শিঞ্জিনীর। ছেলেটি ধরেই নিয়েছে যে সে ওর সঙ্গে যাবে। সারল্যটা বেশ লাগে তার। একটু মজা করতেই বলে ওঠে, "আমি তো আপনাকে বলিনি যে আমি যাব !"

"যাবেন না ?" দুচোখে অপার বিস্ময় ভাসিয়ে নীল প্রশ্ন করে।

"যাবো"। গাঢ় স্বরে শিঞ্জিনী বলে ওঠে।

"আচ্ছা, সেদিন আপনি এলেন না কেন ? আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম আপনার জন্য জানেন ?" নীল প্রসঙ্গ পাল্টায়।

"আসলে আমার জ্বর এসে গিয়েছিলো খুব। কিন্তু আমি আপনাকে সন্ধ্যার দিকে ..."

কথা শেষ হওয়ার আগেই নীল বলে ওঠে, " জানি, মা বলছিল। ভালই হয়েছে। দেখা হয়নি জানেন, সুনীল নেই এখন, বিদেশে"।

"ওহ !", একটু চুপ করে থেকে শিঞ্জিনী বলে, " জানেন, উনি আমার খুব প্রিয় লেখক। আমার স্বপ্নের লেখক। কি করে যেন আমার মনের কথাগুলো সব জেনে যান উনি। আমার খালি মনে হয় যেন আমিই নীরা, এত মিল পাই আমি !"

একটু চুপ করে থেকে নীল বলে ওঠে, " জানেন, আমার নাম আসলে নীল নয়। খাতায়-কলমে আমার অন্য একটা নাম আছে। কিন্তু আমি সবাইকে নীল নামটাই বলি। এমনকি মাকেও জোর করে শিখিয়েছি নীল বলে ডাকতে। আসলে আমার খালি মনে হয় যে আমিই নীললোহিত।"

হঠাৎ চুপ করে যায় দুজনে। যেন কথা হাতড়াচ্ছে তারা। ইতিমধ্যে বাস ধর্মতলায় এসে পৌঁছে যায়। নীল শিঞ্জিনীকে নিয়ে ওঠে ফলতার একটা বাসে। সারা রাস্তা দুজনে বেশী কথা বলে উঠতে পারে না। হঠাৎ কি যেন এক সংকোচ এসে বসেছে তাদের মধ্যে। তবু টুকটাক কথা চালাতে থাকে দুজনে।

আশ্রমে পৌঁছে শিঞ্জিনী মুগ্ধ হয়ে যায়। ছিমছাম একটি আশ্রম, গঙ্গার ঠিক ধারেই। সুন্দর করে বাঁধানো একটি পুকুর, অনেক গাছ, আর তিন ঘরের ছোট্ট এক কুটির, তার একটা ঘরে মন্দির, একটায় সাধুবাবা থাকেন, আর একটায় গ্রামের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন সাধুবাবা।

সাধুবাবার নাম মাধবানন্দ, বয়স ৪৫ এর কোঠায়। ঋজু, সৌম্য চেহারা। নীলকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, বোঝাই যাচ্ছে। শিঞ্জিনীকেও দ্রুত আপন করে নিলেন এ'ভাবে যেন অনেকদিন চেনেন। এখানে এসেই মহাব্যস্ত হয়ে পড়েছে নীল, জড়তা কেটে গেছে যেন তার। ঔষধগুলো গুছিয়ে রাখছে সযত্নে। তাকে দেখে উৎসাহ এসে যায় শিঞ্জিনীরও। সেও হাত লাগায়

নীলের সঙ্গে। তারপর সারাদিন আশ্রমের নানা কাজ করে চলে তারা একসঙ্গে। আশ্রম প্রাঙ্গন পরিস্কার, সাধুবাবার কাছে ঔষধ নিতে আসা গ্রামের গরীব মানুষগুলোর হাতে-হাতে ঔষধ দিয়ে দেওয়া, পুকুরের মাছেদের খাবার দেওয়া, দুপুরে ভাত, ডাল, নিরামিষ তরকারি খাওয়া – হু হু করে দিনটা কাটতে থাকে শিঞ্জিনীর। তার মনে হয়, এমন একটা বেড়ানোই চেয়েছিল সে। আর চলতে থাকে তার আর নীলের অনর্গল কথা। সাহিত্যের কথা, কবিতার কথা, সুনীলের কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা।

এক সময় বিকেল গড়িয়ে আসে। এবার সাধুবাবার থেকে বিদায় নেয় তারা। বাসস্ট্যান্ডে ফিরতে ফিরতে নীল হঠাৎ বলে ওঠে "শিঞ্জিনী গঙ্গার ধারে যাবে একবার ? চমৎকার সূর্যাস্ত দেখা ওখানটায়"। দুজনে এসে দাঁড়ায় গঙ্গার ধারে। সূর্যদেব তখন গঙ্গার অপর পারে বিদায় নিচ্ছেন। রক্তের মতো রঙিন গোধূলি রাঙিয়ে দিচ্ছে গঙ্গাকে, তাদের দুজনকেও। হঠাৎ উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে নীল, "তখন রাত্রি আঁধার হল, সাঙ্গ হল কাজ"। চমৎকার আবৃত্তি করে নীল, শিঞ্জিনী ভাবে।

সন্ধ্যা ছিঁড়ে দ্রুতগতিতে শহরে ফিরতে থাকে বাস। লোক বেশী নেই। দুটি অল্পবয়স্ক নারীপুরুষ পাশাপাশি বসে আছে বিভোর হয়ে সেই বাসে। তাদের মধ্যে যেন এক স্থৈর্যের ভাব। যেন কি এক অনুভূতিতে ভরে আছে দুজনে। কথা বিশেষ বলছে না তারা। হয়তো ভাবছে, এমন আরেকটা দিন কি আসবে তাদের জীবনে ? আজকের দিনটি বড় পবিত্র, বড় সুন্দর, বড় অন্যরকম কেটেছে তাদের জীবনে। এমন একটা দিনের নাম কি ? এখন তাদের মনে রঙের যে খেলা চলছে তার অর্থ কি ? আছে কি আদৌ কোনও তাৎপর্য ? এমন এক দিনের জন্যই কি তিলে তিলে বাঁচে তারা ? হাজারো প্রশ্ন আর ভালো লাগার অনুভূতির ভীড়ে শহরের কোলাহলে ফিরতে থাকে দুজনে।

সে দিনের কথা আর নয়। নতুন করে বলবারও নেই তেমন কিছু। যে যার ঘরে ফিরে গিয়েছিল দুজনে। শুধু সেই রাতে অনেক রাত অবধি জেগেছিল তারা, ভেবেছিল নিজেদের কথা, এবং অপরের কথা, এমন সব কথা যা বলা যেতে পারত সেদিন, বলা হয়ে ওঠেনি, এমন সব কথা যা অনেক সময় বলা হয়ে ওঠেনা, বলা যায়না, আজ অথবা কোনদিনই না। সে সব কথা কোনদিনই ঘটনা হয়ে ওঠেনা, শুধু কথা হয়েই থেকে যায় মনের গভীরে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আজকের সন্ধ্যাটিকে আরও ঘন করে তুলেছে জলভরা কালো মেঘের দল। সূর্যদেব আজকের মতো বিদায় নিয়েও রেখে গিয়েছেন দু-চার ফোঁটা কমলা আলো মেঘেদের চোখে। কি এক বিষণ্ণতায় যেন নিজেকে মুড়ে রেখেছে কলকাতা শহর আজ। যেন চোখের কোণে অশ্রুরা এসে জড়ো হয়ে রয়েছে কিন্তু কি এক কারণে তা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছেনা। শিঞ্জিনীর মনও আজ এই শহরের মতোই। বিমল আর উমার সঙ্গে ট্যাক্সি চড়ে চলেছে সে ফার্ন রোডে সতীশ কাকুদের বাড়ি। সতীশ কাকু বাবার ছোট বেলার বন্ধু, এখন কর্মসূত্রেও তাদের যোগাযোগ যথেষ্ঠ। সতীশ দত্ত বেশ ধনী, স্ত্রী মায়া আর একমাত্র সন্তান অনিন্দ্য কে নিয়ে তার ভরা সংসার। অনিন্দ্য অত্যন্ত কৃতি ছাত্র, সে বছর তিনেক হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে, এখন বড় এক কোম্পানিতে চাকুরিরত। দেখতেও বেশ সুন্দর ছেলেটা, মাঝারি উচ্চতা, ফর্সা রঙ, নাক-চোখ বেশ ঝকঝকে, তার আচরণেও বেশ একটা সহজ, সপ্রতিভ ভাব আছে। শিঞ্জিনী জানে বিমল আর উমার মনের গোপন ইচ্ছা অনিন্দ্যর সঙ্গে শিঞ্জিনীর বিয়ে হোক ভবিষ্যতে, যদিও মুখ ফুটে সতীশকে বলেননি কখনও। অনিন্দ্য ছেলেটি তার প্রতি অন্য কোনরকম আকর্ষণ অনুভব করে, এটা শিঞ্জিনীর কোনদিনই মনে হয়না। শিঞ্জিনীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা নিছকই পোশাকি। শিঞ্জিনীও অনিন্দ্যকে অন্য দৃষ্টিতে দেখবার কোনও প্রয়োজন অনুভব করেনি আজ অবধি। সত্যি বলতে কি, অনিন্দ্যর সঙ্গে বেশীক্ষণ বাক্যালাপ করা মুশকিল হয়ে ওঠে তার পক্ষে মাঝে-মাঝে। অনিন্দ্য বস্তুবাদী, বাস্তবের নিরিখে সে যাচাই করে সবকিছু। কবিতা তার কাছে আদৌ কোনও আকর্ষণীয় বস্তু নয়, তারচেয়ে দেশের অর্থনীতির হালচাল তার কাছে অনেক বেশী জরুরী বিষয় বলে পরিগণিত হয়। আজ সতীশ এমনিই নিমন্ত্রণ করেছেন তাদের। অনেকদিন দুটি পরিবারের মধ্যে জমিয়ে আড্ডা হয়না, তাই এই আয়োজন। শিঞ্জিনীরা পৌঁছতেই হইহই করে ওঠেন সতীশ। বন্ধুকে সত্যিই ভালবাসেন তিনি। শিঞ্জিনীর সম্বন্ধেও তাঁর মনে নির্দিষ্ট একটি মনোভাব আছে যা তিনি প্রকাশিত হতে দেননি আজ অবধি। বৈঠকখানায় গল্প জমে উঠতে একটু পরে এসে অনিন্দ্যও যোগ

দেয়। আজ অনিন্দ্য একটু অপ্রতিভ ভিতর ভিতর। আজ সকালে এমন এক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার যা আগে কখনও ঘটেনি। শিঞ্জিনীকে সে সাধারণ দৃষ্টিতেই দেখে এসেছে এতোকাল, মেয়েটি বেশ ভদ্র-সভ্য, সুন্দরীও কিন্তু ওর সঙ্গে গল্প জমেনা তার তেমন। কেমন যেন উদাস মেয়েটি ! কিন্তু আজ সকালে মায়া যখন জানালেন যে আজ বিমল কাকুরা আসছেন, অনিন্দ্যর মনটা কেমন যেন খুশী হয়ে উঠল এই ভেবে যে আজ শিঞ্জিনী আসবে। সে বুঝতে পারল, তার মনে একটা প্রতীক্ষা তৈরি হচ্ছে এই বিষয়ে। তার ইচ্ছা করছে শিঞ্জিনীকে দেখতে, তার সঙ্গে কথা বলতে। কেন এমন হল, কিছুতেই বুঝতে পারছেনা অনিন্দ্য। তাই সে আজ একটু গুটিয়ে, তার সপ্রতিভ ভাব যেন কম আজ একটু।

"শিঞ্জিনীকে নিয়ে যা না তোর ঘরে অনি!" মায়া বলে উঠল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, এসো শিঞ্জিনী", আগ্রহে উঠে দাঁড়ায় অনিন্দ্য সোফা ছেড়ে।

শিঞ্জিনী টের পায় আজ অনিন্দ্য যেন একটু অন্যরকম হয়ে আছে। বেশ নরম এক দৃষ্টিতে অনিন্দ্য তাকে দেখে চলেছে। সে চোখে যেন আলতো এক মুগ্ধতা, কোনও লেহন নেই সে চেয়ে থাকায়। শিঞ্জিনীর অস্বস্তি হয়, সে বোঝে অনিন্দ্যর ভালো লাগা প্রকাশিত হতে চাইছে আজ কোনও কারণে। এমনিতেই বেশী কথা বলতে পারেনা তারা, আজ যেন নিস্তব্ধতা গ্রাস করেছে ঘরটাকে।

অনিন্দ্যই উদ্যোগ নেয় নীরবতা ভঙ্গের, "তারপর, শিঞ্জিনী, তোমার পড়াশুনা ভালো চলছে ?"

মৃদু একটি "হ্যাঁ"-তে কাজ সারে শিঞ্জিনী।

একটু পরে শিঞ্জিনীর ভদ্রতাবোধ প্রশ্ন করে ওঠে, "তোমার চাকরি ভালো চলছে ?"

"হ্যাঁ, ভালোই চলছে বেশ। জানো, এখনও মা, বাবাকে বলিনি, ইনফ্যাক্ট, তোমাকেই প্রথম বলছি, আমি বোধহয় USA যেতে পারি একটা প্রোজেক্টে"।

"বাঃ! খুব ভালো"।

"হ্যাঁ, খুব ভালো, সত্যিই খুব ভালো। জানো শিঞ্জিনী, USA যাওয়ার ইচ্ছা আমার সেই কবে থেকে। চিরকাল স্বপ্ন দেখেছি স্টেটস যাচ্ছি, সেখানে সেটল করছি। কি আছে এখানে বলতে পারো ? কোনও ভবিষ্যৎ নেই এ দেশের"।

"তা কেন হবে ? এটা বোধহয় ঠিক নয় অনিন্দ্য" শিঞ্জিনী তার মত দেয়।

"না, এটাই ঠিক। দেখছ না, দেশে ওপেন ইকনমি আসবার উদ্যোগের কেমন বিরোধিতা চলছে। আরে বাবা, যুগ পাল্টে গেছে, এটা বুঝতে হবে। এখন গোটা বিশ্ব একটা বাজার, হাতের মুঠোয় ধরা যায় পৃথিবীকে এখন। সেখানে ক্লোজড ইকনমির দিন শেষ শিঞ্জিনী"।

"দ্যাখো অনিন্দ্য, বিষয়টা আমি ঠিক বুঝিনা বটে, কিন্তু তবু মনে প্রশ্ন জাগে এত উদার হওয়া কি সত্যিই ভালো যাতে অন্যের এসে আমাদের বুকে চেপে বসবার সম্ভাবনা থাকে? একটা দেশ গোটা পৃথিবীর রাজা হয়ে যাচ্ছে, মনোপলি স্থাপন করছে, এটা ঠিক নয় বোধহয়। ভাবো, পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের যে দশা হল, এই যে সোভিয়েত ইউনিয়ান ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে গেল, এটা কি পৃথিবীর পক্ষে ভালো হল ?"

"দ্যাখো, শিঞ্জিনী, কমিউনিজম বেসিক্যালি অবাস্তব একটা কনসেপ্ট। ও জিনিষ আজকের যুগে অচল। আজকের যুগ সারভাইবাল অব দ্যা ফিটেস্টের যুগ। এখানে হয় টেঁকো, না হলে মরো। সোভিয়েতে যেটা ঘটেছে সেটা মানুষের অধিকারের উপর অত্যাধিক খবরদারির ফল"।

"হয়তো প্রয়োগ ঠিক হয়নি। কিন্তু প্রয়োগ ক্ষমতার অভাব কোনও তত্ত্বের অসারতা তো প্রমাণ করেনা। কমিউনিজম আদতে একটা দর্শন, কার্ল মার্ক্স তো দার্শনিক ছিলেন মূলতঃ। আর তাছাড়া কিছু মানুষ সমস্তটা পাবে, অন্যরা কিছুই পাবেনা, প্রতিযোগিতার নামে এই অসাম্যের চেয়ে কি সবার মধ্যে ন্যুনতম বণ্টন ভালো নয় অনিন্দ্য ?"

"এটা তোমার পাতি মধ্যবিত্ত মানসিকতার ফল", অনিন্দ্য ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠে।

"হতে পারে, কিন্তু অনিন্দ্য, এ জগতের যত শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি, যত সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ, তা মধ্যবিত্ত সমাজই যুগে যুগে ডেকে এনেছে, তোমার যোগ্য ধনী সমাজ নয় কিন্তু"। স্থির গলায় বলে শিঞ্জিনী।

"কি রে ? কি এত বক বক করছিস তোরা ? খাবি আয় এবার"। হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে মায়া।

খাওয়ার টেবিলে আর বেশী কথা এগোয় না অনিন্দ্য আর শিঞ্জিনীর। সেদিন ফেরবার পথে শিঞ্জিনী মনে মনে বলে, মা-বাবা যাই ভাবুন, অনিন্দ্যর সঙ্গে জীবন বাঁধা বোধহয় সম্ভব নয় তারপক্ষে। তারকাছে আজ এটা স্পষ্ট যে অনিন্দ্য ও সে দুটি ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা। সে রাতে ঘুমের মধ্যে নীলকে স্বপ্নে দেখে শিঞ্জিনী। দেখে নীল মস্ত এক আলোকের গোলক হাতে অন্ধকারে একটা মাঠ পেরোচ্ছে, তার মুখে এসে পড়ছে উজ্জ্বল আলো, সেই আলোয় শিঞ্জিনী যেন দেখতে পাচ্ছে নীলের মুখটা আস্তে আস্তে সুনীল গঙ্গোপাধায়ের মতো হয়ে যাচ্ছে।

(চলবে)

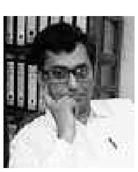

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

শকুন্তলা চৌধুরী

পরবাসী

পর্ব ২

(২)

অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে প্রায় ৬টা বেজে গেলো, রীতির বাড়ী যেতে আরো দেড় ঘন্টা..... Bangalore-এ traffic-এর যা অবস্থা হয়েছে এখন! মাত্র দু'দিনের tour আর রীতির সঙ্গে গতমাসেই দেখা হয়েছে – এবারে হয়তো এতদূর আসতো না বাপ্পা এমনিতে, যদি না মা-কে নিয়ে আরেকবার কথা বলার তাগিদটা ওকে টেনে নিয়ে আসতো। কথা তো কতবারই বলেছে, মতের কোনো নড়চড় তো হয়নি রীতির...... তবু গত সপ্তাহে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার পর মনে হলো 'আরেকবার শেষ চেষ্টা করে দেখি!'

মা হাত ধরে promise করিয়ে নিয়েছে যে অসুখের কথা বলা যাবে না, sentimental blackmail করা চলবে না। অগত্যা বাপ্পা অন্যভাবে কথা পাড়ে – "তুই এরমধ্যে কলকাতা আসবি না?" রীতি ঘাড় নেড়ে বলে – "না। তোমার মতো আমার কলকাতা অন্ত প্রাণ না দাদাভাই, কলকাতায় আছে কে ? বাবা থাকতে তো যেতাম প্রতিমাসে..... এখন আর ভাল্লাগে না।" বাপ্পা বলবে না বলবে না করেও বলে ফেললো – "মা তো এখন কলকাতায় রে, তোর একবারও মনে হয়না যে মা'র সঙ্গে দেখা করবি ?"

রীতির স্থির চোখের দিকে তাকিয়েই বাপ্পা বুঝতে পারলো যে ভুল হয়ে গেছে – এটা না বললেই ভালো হতো।

কিন্তু তীর ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে এবং যেখানে লাগার সেখানে লেগেছে। খুব আস্তে, কেটে কেটে রীতি বললো – "কার মা, দাদাভাই? তোমার?..... তোমাকে তো অনেকবার বলেছি দাদাভাই যে আমার মা নেই, কোনদিন ছিলো না। আমার বাবা ছিলেন single parent, একা হাতে মানুষ করেছিলেন আমায় ৫ মাস বয়স থেকে, গীতামাসীর সাহায্যে। আমায় school এ নিয়ে গেছেন বাবা, teen age-এর ধাক্কা সামলেছেন বাবা, আমার তাসের ঘরে আলো জ্বেলে রেখেছিলেন বাবা আর class five-এ যখন বন্ধুরা আমাকে বলেছিলো 'তোর মা তো মারা যায়নি, তোকে ফেলে পালিয়ে গেছে' তখন বিধ্বস্ত আমাকে জীবনের কঠিনতম কাহিনী শুনিয়েছিলেন বাবা, Higher Secondary-তে খারাপ result করে যখন ভালো কলেজের রাস্তা সব বন্ধ করে দিয়েছিলাম তখন কার যেন হাতে-পায়ে ধরে আমাকে শেষপর্যন্ত IT -র দরজায় কোনক্রমে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বাবা..... এইসবের মাঝে মা-কে কোথায় দেখছো তুমি ?..... আমায়, আমাদের জীবন দিতে দিতে বাবার নিজের জীবনটাই যে হঠাৎ ফুরিয়ে গেলো সেটা তোমার মনে পড়ে দাদাভাই? কেন বলো তো ? কার জন্যে হলো এটা ? কে দায়ী ?..... ৫৯ বছর কি একটা বয়স ঐরকম massive heart attack-এর জন্যে? আর সেই family তে যেখানে average longevity is about 75!....."

অপরাধীর মতো মুখ নিচু করে বসে থাকে বাপ্পা, যেন সবকিছুর জন্যে সে-ই দায়ী।

রীতি কিন্তু থামে না, জেদী গলায় বলে চলে – "সেই মহিলা, যাকে তুমি 'মা' বলছো, তিনি তখন কোথায় ছিলেন ?.... Second honeymoon-এ ? নাকি....."

বাপ্পা বলে ওঠে – "মায়ের জীবনটাও সুখে কাটেনি রে, তুই একবার কথা বললেই বুঝবি...."

রীতি রেগে যায় – "Why should I? Riti Banerjee does not need a mother now, neither is Riti Banerjee a social worker. 'সুখে কাটেনি' – my foot! She had chosen that life herself, with her eyes and ears open.

আমরা কেমন আছি সেটা যার কোনদিন মনে হয়নি, তার সুখ-দুঃখের খবর আমি কেন নিতে যাবো দাদাভাই ? .... A selfish creature.....a slut....."

বাপ্পা এবারে হাত তুলে রীতিকে থামিয়ে দ্যায় – "আমি আর শুনতে চাই না রীতি, that is enough! .....You have become a prisoner of your own emotions – please let go. If not for মা, for yourself please."

রীতি অসহিষ্ণু গলায় বলে ওঠে – "Prisoner...of course! মুক্ত আকাশের আলো যার দেওয়ার কথা ছিলো, সে তো শুধু অন্ধকারই দিয়েছে....that darkness was a prison..."

বাপ্পা উঠে দাঁড়ায় – "রাত হয়েছে, আমি চলি এবার। হোটেলে ফিরে driver কে ছেড়ে দিতে হবে, বেচারা সকাল থেকে চরকিপাক খাচ্ছে আমার সঙ্গে। .... When is Raj coming back?"

রীতি নিজেকে সামলে নেয়, বলে – "He is out till the end of the week. Seeing his parents after his meeting in Delhi."

বাপ্পাকে গাড়ী অবধি পৌঁছে দিয়ে রীতি ঘরে এসে বসলো। রাগটা এখনো পুরো যায়নি, কিন্তু বাপ্পার এই এক কায়দা – তর্ক বেড়ে উঠলেই ও রণে ভঙ্গ দেবে! এমনভাবে রীতির মুখ বন্ধ করে দেবে যে রীতি রাগে ছটফট করলেও কিছু বলতে পারবে না। রীতি মনে মনে ঝগড়া করতে লাগলো বাপ্পার সঙ্গে – "কেন এটা করো তুমি দাদাভাই ? কিসের জন্যে ? ...."

বাপ্পার এই sentiment-টা সত্যি বোঝা মুস্কিল। ছয়বছরের ছেলেকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে যে চলে যেতে পারে, তাকে নিয়ে ও কেন এতো ব্যাকুল? বাবা বেঁচে থাকতে যার নাম আভাসে ইঙ্গিতেও কেউ করতে সাহস পেতো না, আজ বাবা নেই বলে কি .....?

বাপ্পার সঙ্গে অনেক তর্ক করেছে রীতি এই নিয়ে।

ওর একটাই উত্তর – "বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন যথাসম্ভব তাঁকে শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তাঁর কথা শুনে চলার চেষ্টা করেছি। আজ বাবা নেই, আর তিনি আমাকে কোনোভাবে শপথবদ্ধ করেও যাননি। তাহলে কেন আজ আমি মা'র কাছে যাবো না, তাঁর কথা শোনার চেষ্টা করবো না ? মা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, don't forget that Riti."

"জন্ম দিলেই মা হওয়ার দাবী করা যায় না দাদাভাই ...." রীতি তর্ক করেছে।

"নিশ্চয়ই যায়। একটা ছোট্ট বীজকে নয়মাস ধরে নিজের শরীরের অংশ দিয়ে একটু একটু করে বড় করে তোলাটাও সোজা নয়। মানলাম যে তার পরবর্তী যুদ্ধটা ছিলো বাবার একার, তোর ক্ষেত্রে তো বটেই... আমার ক্ষেত্রেও almost – মা সেখানে কিছুই করেননি। কিন্তু pregnancy and giving birth – এইদুটো বড় যুদ্ধ কিন্তু মা-ই করেছিলেন !"

"You are too sentimental and forgiving, দাদাভাই।" রীতি বলেছে।

বাপ্পা শান্তভাবে উত্তর দিয়েছে – "Who am I to forgive or judge my mother, or anyone for that matter ? .... জীবনে কে যে কেন কোন কাজটা করতে বাধ্য হয়, সেটা না জেনে কিছুই বলা চলে না।"

"So, are you going to blame Baba now?" – রীতির ঝটিতি প্রশ্ন তীরের মতো ছুটে আসে।

"Of course not..... আমি শুধু তোকে বলছি মনটা open রাখতে।.... নিজের মা না ভেবে, তুই অন্যভাবে ভাব। চিন্তা করে দ্যাখ যে একজন মধ্যবিত্ত ঘরের বিবাহিতা মহিলা, বিয়ের সাত বছর পর কেন হঠাৎ তাঁর সাজানো সংসার ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াবেন ?! কেন ? .... মন খোলা রাখলে আমাদের চোখ-কানও খুলে যায়; আমরা তখন অনেক কিছু

বুঝতে পারি যা otherwise আমাদের চোখের সামনে থাকলেও আমরা দেখতে পাইনা বা দেখার চেষ্টা করি না।" – বাপ্পা একটু থামে।

"You are incorrigible!" বলে রীতি উঠে গেছিলো drinks আনতে।

এই টানাপোড়েন চলছে আজ প্রায় একবছরের ওপর। যবে থেকে দাদাভাই সেই মহিলাকে কোথায় যেন meet করেছে, আর সমানে রীতিকে বুঝিয়ে যাচ্ছে কলকাতায় গিয়ে একবার দেখা করতে। রীতির মনের মধ্যে একরাশ ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই জড়িয়ে নেই ঐ নামটার সঙ্গে, রীতি তাই অনড়। সেদিন মহিলার ইচ্ছে জয়ী হয়েছিলো, আজ জয়ী হবে রীতির ইচ্ছে। বিশেষ করে বাবার মৃত্যুর পর, অকালমৃত্যু বলাই ভালো, কোনো প্রশ্নই নেই সেই মহিলাকে ক্ষমা করে সংসারে ডেকে আনার। চুলে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ফ্রীজ থেকে বিয়ারের can টা বের করলো রীতি। এক হাতে can খুলতে খুলতে, অন্যহাতে TV টা on করে দিলো।..... একঘেয়ে খবর! চ্যানেল ঘুরিয়েও কোনো লাভ নেই – সেই থোড়-বড়ি-খাড়া!

হঠাৎ একটু হাসি পেয়ে গেলো রীতির। কতদিন বাদে এই কথাটা বললো ও! ছোটবেলায় এটা কিছুতেই বলতে পারতো না। গীতামাসীকে নকল করে বলার চেষ্টা করতো কিন্তু মুখ দিয়ে ঠিক বেরোতো না। বলতো – 'বোল-থরি-খাতা'। গীতামাসী শুনে হাসতো, বলতো – 'কথা শোনো পাকা মেয়ের! মুখ দিয়ে বেরুবে না, তবু বলা চাই।'

গীতামাসী হাসতো..... গীতামাসী ওকে ঠিক করে কথা বলতে শেখাতো..... গীতামাসী ওকে বিকেলে সাজিয়ে গুজিয়ে সামনের পার্কে বেড়াতে নিয়ে যেতো..... গীতামাসী ওকে খাওয়াতো..... গীতামাসী ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিতো। আর আজ দাদাভাই যদি একজনকে এনে ওর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে – "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", তাহলেই কি সেই পুরোনো পাতাগুলোয় আবার নতুন করে গল্প লেখা যাবে? জীবনের সব অঙ্কগুলো মিলে যাবে? ক্লাস ফাইভের সেই বীভৎস দিনটা স্মৃতি থেকে মুছে যাবে? আর.... আর বাবাকে ফিরিয়ে আনা যাবে?

Mood টা off হয়ে গেছে রীতির – TV ভালো লাগছে না। রাজকে Goodnight kiss পাঠিয়ে ফোনটাও mute করে দিলো। আলোটা নিভিয়ে দিতে জ্যোৎস্নায় ঘর ভরে গেলো, পূর্ণিমা বোধহয় আজ।

ফোনটা হাতে নিয়ে একবার ফেসবুকে গেলো, এলোমেলো কতগুলো পোস্ট দেখতে দেখতে আবার সেই পেজে চলে গেলো। বাপ্পার কাছে শুনেছে এখন last name সেন। বাপ্পা ফেসবুকে নেই, রীতিও বিশেষ যেতো না আগে – ইন্সটগ্রামেই ও বেশী যায়। তবে এখন মাঝে মাঝে ফেসবুক দেখে। আজও যেমন গেলো ফেসবুকের পাতায়। সেই চেনা মুখ, চোখে এখন চশমা। বিশেষ কিছু পোস্ট নেই। বহুদিন কোনো আপডেট নেই। বছর দুয়েক আগের একটা প্রোফাইল পিকচার, ফাঁকা মাঠে একা দাঁড়িয়ে। চিনতে কোনো অসুবিধে হয়নি। কমবয়সের একটা ছবি তো অনেকদিন পর্যন্ত ওর ঘরের দেওয়ালেই ছিলো। শুতে যাবার আগে রীতি ছবিটাকে আদর করে বলতো – "মামণি, আমি শুতে যাচ্ছি। তুমিও শুয়ে পড়ো, চাঁদমামার সঙ্গে এখন গল্প করো না যেন! অনেক রাত হয়ে গেছে।" বলতো এইসব। গল্প করতো ছবিটার সঙ্গে। অনেকদিন অবধি।.... ক্লাস ফাইভের পর আর বলেনি। ক'দিন পরে ছবিটাকেই আর দেখতে পায়নি। বাবা বোধহয় সরিয়ে দিয়েছিলেন।

বাপ্পা বলেছিলো মহিলা নাকি দেশে ফিরে এসে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন বাপ্পা আর বাপ্পার বোনের সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছায়। How dare she!

মাথাটা গরম হয়ে গেছে। ঘুম আসবে না সহজে আজ। বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে ঠাণ্ডা জল দিলো রীতি। ঘাড়ে ভিজে towel রাখলো। বেরিয়ে এসে study তে ঢুকলো। বাবার ছবির দিকে তাকালো একবার। নিজের মনেই বললো – "আমি ভুলিনি বাবা..... আমি ভুলবো না! দাদাভাই ভুললেও, আমি ভুলবো না।"

বাপ্পার সঙ্গে কি আজ একটু বেশী rude হয়েছিলো রীতি ?.... বোধহয় !.... কেন যে বাপ্পা ওকে জোর করে !

খাটে এসে বসে ফোনটা আবার হাতে নিলো রীতি । একটু ইতস্তত করে লিখলো – "Sorry Dadabhai...."

নাঃ, 'Sorry' কিসের ? কথাগুলো তো রীতি ভুল বলেনি ! Delete করে দিলো text টা ।

আবার লিখলো – "Have a safe flight back, Dadabhai. Goodnight!"

তারপর শুয়ে পড়লো ।

(৩)

গাড়ীতে উঠে চোখ বন্ধ করলো বাপ্পা । খুব tired লাগছে । শুধু শারীরিক ক্লান্তি নয়, মানসিক চাপও অনেক যাচ্ছে । আহেলী বলছে ক'দিন ছুটি নিতে, সাম্যর summer vacation শুরু হলে বেরিয়ে আসবে কোথাও থেকে ক'দিনের জন্যে । অবশ্য সবই নির্ভর করছে মা কেমন থাকে তার ওপর, আহেলী জানে সেটা । আশ্চর্য ! আহেলী যেটা বুঝেছে এবং মেনে নিয়েছে, নিজের মেয়ে হয়েও রীতি সেটা বুঝতে চাইছে না ! নাকি মেয়ে বলেই বুঝতে চাইছে না..... she is taking everything personally.

বাপ্পা জানে যে রীতি নিজেকে পরিত্যক্ত মনে করে আর সেটা মেনে নেওয়া ওর জন্যে খুব কঠিন । সেই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে পারছে না বলেই রীতি আজও তিক্ত ! চিরকালই রীতি খুব জেদী – অন্যের কথা মানতে চায় না । গীতামাসী বলতো – "অনেক ছেলেপুলে দেখেছি বাপু, এমনটি দেখিনি..... জেদ করে বিষ খেতে পারে এই মেয়ে !" বিষই তো পান করে যাচ্ছে রীতি রোজ জীবন থেকে, অথচ একটু হাত বাড়ালে হয়তো সুধাসাগরের তীরে বসে একফোঁটা অমৃত তুলে নেওয়া খুব কঠিন হতো না ওর জন্যে । কিন্তু রীতি তা করবে না – ও বাপ্পাকে ভাবে ভাবপ্রবণ, দূর্বল । বাপ্পা বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছে, কোনো লাভ হয়নি ।

বাপ্পার জন্যেই কি খুব সহজ ছিলো, একদিন সকালে উঠে হঠাৎ জানা যে 'মা নেই' ! বাপ্পার ৬ বছরের জীবনটা তখন ছিলো মা-ময় । মা ঘুম থেকে তুলে দিচ্ছে, দাঁত মেজে দিচ্ছে, school-এ নিয়ে যাচ্ছে, চান করাতে করাতে গুনগুন করে গান গাইছে "কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা...." – সব, সব করে দিচ্ছে মা । বোন হওয়ার পরেও । সেই মা একদিন হঠাৎ হারিয়ে গেলো । বাপ্পাকে বলা হলো যে মা এমন জায়গায় চলে গেছে যেখানে গেলে আর ফেরা যায় না । বাপ্পা অনেক কেঁদেছিলো, ঠাকুমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বলেছিলো – "আমি তোমার কাছে খাবো না । মা না এলে আমি কিচ্ছু খাবো না ।" কিন্তু বাপ্পা তো আর রীতি নয় – জেদ করা বাপ্পার স্বভাব নয় । তাই কষ্ট হলেও বাপ্পা একা একা খেতে শিখলো, নিজে নিজে জুতোর ফিতে বাঁধতে শিখলো, আরও কত কি শিখলো..... বাপ্পা বড় হয়ে গেলো । ঠাকুমা-দাদু ফিরে গেলো কল্যাণীতে । গীতামাসী এলো রান্না করতে আর বোনকে সামলাতে । বাবা এতো চুপ হয়ে গেলো যে বাপ্পা নিজের কান্না চেপে রেখে বাবাকে বলতে লাগলো – "চলো না বাবা, আজ বোনটাকে zoo তে নিয়ে যাই ? বোনটা তো কিছুই দেখেনি এখনো !"

"সাব, কাল কিতনে বাজে আনা ?" – ড্রাইভারের কথায় চমক ভাঙলো বাপ্পার । হোটেলে পৌঁছে গেছে গাড়ী । ড্রাইভারকে সকাল ৯টায় আসতে বলে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো বাপ্পা । কাল সকালে একটা meeting cover করতে হবে । তারপর একবার office এ ঢুঁ মেরেই সোজা airport এ দৌড় । এই journalism এর চাকরিতে দৌড়োদৌড়ি খুবই, কিন্তু তাও বাপ্পার ভালো লাগে । রোজ যেন একটা নতুন কিছু পাচ্ছে, দেখছে – একঘেয়েমি নেই । জীবনকে অনেকভাবে দেখা যায়, অনেক কিছু শেখা যায় সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে । মনটাও বোধহয় অনেক উন্মুক্ত হয়ে যায়, গোঁড়ামি কেটে যায় । ইচ্ছে করলে বাপ্পা এখন office এর ঠান্ডা ঘরে বসেই ২৪/৭ কাজ করতে পারে,

সিনিয়রিটির দোহাই দিয়ে। Spot এ গিয়ে interesting news cover না করলেও চলে ওর। কিন্তু কেমন যেন নেশা হয়ে গেছে বাপ্পার।

এই কাজের সূত্র ধরেই মা'য়ের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিলো, সুদীর্ঘ ৩১ বছর পরে। ডঃ দত্তর interview নিতে গিয়েছিলো বাপ্পা, ওনার চেম্বারে। Private nursing home নিয়ে কেলেঙ্কারী আর মানুষের বিতৃষ্ণা তখন চরমে উঠেছে। ডঃ দত্তর চিকিৎসক হিসেবে সুনাম আছে, মানুষ হিসেবেও। 'আগে টাকা হাতে, তবে চিকিৎসা' এইরকম বাঁধা গতে উনি এখনো চলেন না। ওনার মতামতের দাম তাই সবদিক দিয়েই বেশী। উনি যা বলবেন সেটা নিরপেক্ষ মত হবে, তাই দু'দিকের লোকজনই মন দিয়ে পড়বে।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সময় দিয়েছিলেন ডঃ দত্ত, চেম্বার ঠিক শেষ হওয়ার পর। বাপ্পা একটু আগেই পৌঁছে গিয়েছিলো। আর একজনই পেশেন্ট বাকী, সেটা হয়ে গেলেই বাপ্পা যেতে পারে – রিসেপশনিস্ট মেয়েটি জানালো। চেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিলো বাপ্পা। উল্টোদিকের চেয়ারে আরেকজন ভদ্রমহিলা বসে কাগজ পড়ছেন, নিশ্চয়ই last patient.

ম্যাগাজিনে আমেরিকার আসন্ন নির্বাচন নিয়ে একটা লেখা পড়তে পড়তে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলো বাপ্পা, হঠাৎ চমক ভাঙলো নার্সের গলার আওয়াজে। দরজা খুলে মিষ্টি হেসে ডাকছেন – "Ms. Suchi Sen...."

চকিতে চোখ গিয়ে পড়লো সামনের ভদ্রমহিলার ওপর – হ্যাঁ, উনিই তো ! চশমাটা ঠিক করে আর শাড়ীটা গুছিয়ে নিয়ে, একটু ঝুঁকে হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রমহিলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন নার্সের সঙ্গে। আবছা একটা ছবি, সময়ের ধুলো পড়ে বিবর্ণ, হঠাৎ যেন চোখের সামনে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেলো।

বাপ্পা তখনো বুঝে উঠতে পারছে না যে এই শুচি সেন সেই শুচি ব্যানার্জ্জী কিনা ! মুখটা ভালো করে লক্ষ্য করা হয়নি..... সাধারণ একটা শাড়ী পরা..... চোখে চশমা.... কাঁচাপাকা চুল...... এই কি বাপ্পার সেই অনিন্দ্যসুন্দরী stylish মা ?

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ভদ্রমহিলা আধঘন্টার মধ্যেই বেরিয়ে এলেন। এবারে পূর্ণদৃষ্টি মেলে মুখের দিকে তাকালো বাপ্পা। চশমার আড়ালে ক্লান্ত দুটো চোখের সৌন্দর্য আজো ধরা যায়। বিবর্ণ গায়ের রঙে ঢাকা পড়ে আছে কোনো এক সোনালী দিনের গল্প।.... আর সর্বোপরি সেই দৃপ্ত smartness, যা বয়সের ভারে ঝুঁকে যায়নি..... শরীরটা ঝুঁকে গেলেও। বাপ্পার আপাদমস্তক কেঁপে উঠলো। 'মা' বলে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলো। ভদ্রমহিলা ওর দিকে তাকিয়ে আবছা হাসলেন, বোধহয় বাপ্পার এইভাবে তাকানোর জন্যেই, তারপর বেরিয়ে গেলেন।

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো আর একবার। মা ? সত্যি, না চোখের ভুল ? কিন্তু মা এখানে.... ডঃ দত্তর চেম্বারে ?

আর ভাবার সময় পেলো না বাপ্পা – ওর ডাক পড়েছে ভেতরে। ডঃ দত্তর অভ্যর্থনার উত্তরে বাপ্পা যে কি বললো আর পরপর প্রশ্ন সাজিয়ে কি যে interview নিলো, নিজের কাছেই পরিষ্কার নয় – ওর মাথাটাই তখন ভালো করে কাজ করছে না। ডঃ দত্তকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো বাপ্পা। একটু ইতস্তত করে শেষপর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে receptionist মেয়েটির সামনে দাঁড়ালো। "Yes Sir ?" মেয়েটি হাসিমুখে চোখ তুললো।

"ইয়ে.... মানে বলছিলাম কি.... ঐ উনি কি শুচি ব্যানার্জি.... মানে উনি কি বম্বে থেকে এসেছেন...." বাপ্পা ঠিক কি বলবে বুঝতে না পেরে এলোমেলো কটা শব্দ ছুঁড়ে দিলো।

মেয়েটি খুব সপ্রতিভ ভাবে হেসে বললো – "কার কথা বলছেন স্যার ? যিনি এইমাত্র বেরোলেন ?... উনি ডঃ দত্তর patient, কলকাতাতেই থাকেন। মাপ করবেন, patient দের কোনো personal information আমরা কাউকে দিতে পারি না।"

বাপ্পা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। Smart একটা হাসি দিয়ে বললো – "Of course, professional ethics...but can you please do me a favor ? আমার মনে হচ্ছে উনি আমাদের খুব পরিচিত একজন, যাঁর ঠিকানা আমরা হারিয়ে ফেলেছি কিন্তু যোগাযোগ করতে চাইছি অনেকদিন ধরে। আমি বরং আমার নাম, ঠিকানা, phone number টা আপনাকে দিয়ে যাই – আপনি যদি একটু কষ্ট করে এটা ওনাকে দিয়ে দ্যান?! যদি উনি তিনিই হন তাহলে নিজেই আমাকে ফোন করবেন – তাতে কোনো অসুবিধে নেই তো ?"

মেয়েটি হেসে বললো – "ঠিক আছে স্যার।"

অন্যমনস্কভাবে বাড়ী এলো সেদিন বাপ্পা। বুঝতে পারছে না মনের ভেতর কিসের ঢেউ ওঠাপড়া করছে – খুশি না রাগ না আশঙ্কা ? মাকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ ? মা কেন বাপ্পাকে ফেলে চলে গিয়েছিলো সেই অভিমান ? নাকি সব ছাপিয়ে যাচ্ছে একটা হিমশীতল ভয় – মা ডঃ দত্তর চেম্বারে কেন ?

খেতে বসেও বাপ্পা অন্যদিনের মত সাম্যর সঙ্গে গল্প জুড়লো না। সাম্য কি যে বলছে ওর যেন মাথাতেই ঢুকছে না ভালো করে। আহেলীর চোখ এড়ালো না ব্যাপারটা, কিন্তু ও খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে – সাম্যর সামনে কিছু বললো না।

রাতে সাম্যকে ওর বিছানায় tuck করে এসে বাপ্পার মুখোমুখি বসলো। কিছু প্রশ্ন করার আগেই বাপ্পা বলে উঠলো – "আজ মা'কে দেখেছি।" আহেলী এত অবাক হয়ে গেলো যে মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না দু'মিনিট।

(চলবে)

১৯৯০ থেকে আমেরিকা প্রবাসী **ডঃ শকুন্তলা চৌধুরী** কর্মসূত্রে এবং ভ্রমণপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষাকে আপন করে নিলেও, বারবার ফিরে ফিরে আসেন এই বাংলায়, তাঁর মাতৃভাষার কাছে এক পরম ভালোবাসার টানে। ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময় স্কুলের পত্রিকায় প্রথম একটি কবিতা প্রকাশ হয়। সেই শুরু, তারপর কলেজ, ইউনিভার্সিটি... প্রবাসের বঙ্গ সম্মেলন এবং আরো নানা পত্রিকায় লেখালেখির ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন, যদিও পেশাগত এবং পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে সে ধারাটি ছিল নেহাতই ক্ষীণকায় নদীর মতো। দুই মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর, ব্যস্ততা একটু কমতেই ... সাহিত্যচর্চার আপাত শীর্ণ নদীটির মধ্য থেকে ফলগুধারা যেন এসে পড়লো সাগরের মোহনায় ! এই জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রকাশিত তাঁর বই "পৃথা" বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃত। ছাত্রজীবন, গোখেল কলেজের অধ্যাপনা, প্রবাসজীবন ও বাস্তব পৃথিবীর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আলো ফেলে তাঁর লেখায়... সেভাবেই একদিন লেখা হয় 'পরবাসী'।

প্রশান্ত চ্যাটার্জী

যুদ্ধ-সহযোদ্ধা-জীবনমরণ

পর্ব ৫

চিরকালই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় বলি হন উলুখাগড়ারাই। যুদ্ধে যেমন সীমান্তের আশেপাশের বাসিন্দারা। পাশের পাড়ার ছোট্টবেলার খেলার সাথীকে রাতারাতি বিদেশী তকমা লাগিয়ে নিষেধের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। বা সহস্র সম্ভাবনাময় একদল যুবককে হঠাতই মারা পড়তে হয় যারা হয়তো কেবল পরিবারকে একটু ভাল রাখবে বলে অন্য উপায় না পেয়ে সেনাবাহিনীতে কেবল চাকরি করতে এসেছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের এই দ্বিতীয় রকম উলুখাগড়ার দলেই একজন ছিলেন প্রশান্ত চ্যাটার্জী। যিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেছিলেন। তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রকাশ এই উলুখাগড়ার দিনলিপি। আজ পঞ্চম পর্ব।

হরফুলের মৃত্যুকে যথেষ্ট সময় আমরা দিতে পারলাম না। আমাদের এগিয়ে যাবার অর্ডার এসেছে। আমরা হুকুম মতো পাকিস্তানের দিকে এগোতে থাকলাম। নির্দেশমত হারবারের জায়গায় গিয়ে প্রথম কাজ ট্রেঞ্চ কাটা। এত বেশি গোলাগুলির আওয়াজ হচ্ছে যে ভয় করছে। যেকোনো সময় কোনো গোলা আমাদের ঠিক ওপরে পড়বে নাতো ? সন্ধ্যার আগের পর্যন্ত প্রথমদিন ঐভাবেই কেটে গেল। অন্ধকার হবার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে ঐখানে তৈরী হয়ে বসে আছি। এবার আমাদের যেতে হবে ট্যাঙ্কের কাছে। কোথায় হারবার করেছে ট্যাংক জানিনা। রেইকি টীম আগে গিয়ে খোঁজ খবর করে আসে। রাতের অন্ধকারে কোনো নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে নয়, আমাদের এগোতে হবে যথা সম্ভব গোপনে। গাড়িতে কোনো লাইট জ্বলবে না। দেখেছি, গাড়ির হেডলাইট হয় ভেঙে দেওয়া হয়। নয়ত, কালো রং করে দেওয়া হয়। FRT team এর wireless mechanic, 'B' vehicle electrician, mechanic সকলকে যেতে হবে। পেট্রোলের গাড়ি, জলের গাড়ি, খাবারের গাড়ি, মেডিকেল টীম সবাই। রাতের অন্ধকারে প্রত্যেকটা ট্যাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করতে হবে, কোনো অসুবিধা আছে কিনা। আমার দায়িত্ব ওয়ারলেস সেটের কোনো অসুবিধা আছে কিনা সেটা দেখা। সাধারণ ভাবে রাত্রে যুদ্ধ বন্ধ থাকে। কারণ সারাদিন যেসব ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করা দরকার। পরের দিনের জন্য ট্যাঙ্ককে রেডি করার জন্য। যেমন পেট্রল ভরা, গাড়ি বা ওয়ারলেস সেটের রিপেয়ার, মেন্টেনেন্স আর সাথে সাথে মানুষের বিশ্রাম। রাত্রে গোলাগুলি চললে তার আগুনে শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সেজন্য রাত্রে সাধারণ ভাবে যুদ্ধ বন্ধ থাকে। কিন্তু ওই, 'সাধারণভাবে'। এরকম প্রতিদিনই রাত্রে ডিউটি থাকত। যখন কোনো কাজ থাকত না তখন ট্যাঙ্কের নীচে গিয়ে বিশ্রাম নিতাম। ট্যাঙ্কের নিচেটা অনেকটা নিরাপদ। হারবারে গিয়ে কাজ না থাকলে, ট্যাঙ্কের ছেলেদের সাথে কথা বলতাম অনেকসময়। কোনো ভয় নেই। কি বেপরোয়া ভাব ওদের লক্ষ্য করতাম। অথচ ওদের প্রাণের ভয় আরো বেশি। তারিখ তো মনেই নেই, অনেকের নামও ভুলে গেছি। আমাদের সাথে Dr. Capt. Kundঁ বলে একজন মেডিকেল অফিসার ছিলেন সেসময়। রেগুলার আর্মি অফিসার নন। যুদ্ধের সময় ভলেন্টিয়ার হয়ে আর্মিতে যোগ দিয়েছিলেন। আমি ওঁনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যুদ্ধের পর উনি আর্মিতে থাকবেন কিনা। উনি বলেছিলেন, "যদি বেঁচে থাকি তাহলে থেকে যেতেও পারি। এখানকার চাকরিতে আলাদা একটা মেজাজ আছে।" ভদ্রলোক খুব ভাল মানুষ ছিলেন। খুব বেশি সিগারেট খেতেন মনে আছে। তাও আবার চারমিনার। নিজে খেতেন, কখনো কখনো আমাদেরও দিতেন। কখনো আবার ওঁনার কাছে না থাকলে চেয়ে খেতেন।

'বিশ্বম্ভরণ' বলে একজন ছিল, সম্ভবত তামিলনাড়ুর। কি রকম সাহস আর কি প্রচন্ড মনের জোর ! রাত্রে যে গোলাগুলি একেবারেই চলে না তা নয়। একদিন রাত্রে, আমাদের সিনিয়র JCO (Junior commission officer) গাড়ি নিয়ে হারবারে গেছেন। সকলের খোঁজ নিচ্ছেন। এবং সেইদিন রাত্রে, ঐরকম গোলাগুলি চলছে। হুইসেল দিয়ে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে। প্রত্যেকে যেন, ট্রেঞ্চে কিংবা ট্যাঙ্কের নিচে চলে যায়। সেইমত আমরা সকলে নিরাপদ জায়গায় বসে আছি।

হঠাৎ দেখি অন্ধকারে কেউ একজন ওই অবস্থায় দৌড়োদৌড়ি করছে। সে আর কেউ নয় আমাদের বিশ্বম্ভরণ। ও কিভাবে খবর পেয়েছে যে JCO-র গাড়ির ট্রেলরে সকলকে দেবার জন্য মদের বোতল রাখা আছে। ওই গোলাগুলির মধ্যে ট্রেলর থেকে বোতল নিয়ে আসতে ছুটেছে। কোনো ভয় নেই প্রাণের। অনেকদিন ধরে ভয়ের পরিবেশে থাকলে বোধহয় ভয় কেটে যায় আস্তে আস্তে।

'আয়াপ্পান' খুব ভাল হকি খেলত। মহীশূরে বাড়ি। কোনো একটা ট্যাঙ্কের crew commander ছিল আয়াপ্পান। একটা ট্যাঙ্কে মোট চারজন থাকে। commander, driver, gunner, এবং যৌথভাবে wireless operator/ loader। অপারেটর/লোডারের কাজ ট্যাঙ্কের গোলা লোড করা। ট্যাঙ্কের কামানে গোলা লোড করা মানে, দুই হাতে গোলাটি নিয়ে কামানের ভিতরে ভরা। এবং গোলাটির ওজন কুড়ি পাউন্ড, প্রায় তিন ফুট লম্বা। একটা ট্যাঙ্কে মোট পঞ্চাশটা কুড়ি পাউন্ডের গোলা স্টক করা থাকে। প্রয়োজনে আবার দেওয়া হয়। একদিন হারবারে শুনলাম, আয়াপ্পান মারা গেছে। ডেডবডি এখনো ট্যাঙ্কের ভেতরেই আছে। আর সেদিনেই আয়াপ্পানের ট্যাঙ্কের ওয়ারলেস সেটের গন্ডগোল হয়েছে ডাইরেক্ট সেলিং এর জন্য। এবং আমারই দায়িত্ব সেই সেট সারানোর। ট্যাঙ্কে উঠে দেখলাম, কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে কারো নাক বরাবর মাথায় আঘাত করলে যেমন মাথার অর্ধেকটা উড়ে যায়, সেই ভাবে সেলিং এ আয়াপ্পানের অর্ধেকটা মাথা উড়ে গেছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। এই এত বছর পরেও ঐদিন রাতের সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসছে আমার। ওকে চেনা পর্যন্ত যাচ্ছেনা। ডেডবডি নামানো হলো। ট্যাঙ্ক ধোয়া মোছা করার পর ওই ট্যাঙ্কের ওয়্যারলেস সেট রিপেয়ার করেছিলাম মনে আছে। ৬৫'র যুদ্ধে আমাদের ইউনিটের মোট চারজন মারা গিয়েছিল। কিন্তু আয়াপ্পনের মৃত্যুটা এখনো জ্বলজ্বল করছে। ওই ট্যাঙ্কের বাকি ক্রু'দের দেখে মনে হচ্ছিল যেন খুব একটা কিছু হয়নি। সকলে মিলে বডিটা নামালো। জল নিয়ে ট্যাংক ধোয়া মোছা করল। তারা রাত্রে সেদিন খেয়েছিল কিনা মনে নেই। তবে পরের দিনের জন্য সব কাজ ঠিক ঠিক করে নিয়েছিল সেটা মনে আছে। মৃত্যু এতই সহজ যুদ্ধক্ষেত্রে। হারবার সেদিন একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন সকাল হবার আগে আমরা ট্যাঙ্কের লোকেশন থেকে অনেকটা পিছনে, সাধারণত Rear team যেখানে থাকে সেই জায়গার জন্য স্টার্ট করলাম। এটাই নিয়ম। রাতের অন্ধকারেই যাতায়াত করতে হবে। ফেরার সময় সেদিন দিনের আলো বেরিয়েছে। ফাঁকা মাঠ দিয়ে যাতায়াত করে করে গাড়ির চাকার একটা ট্র্যাক তৈরী হয়েছে। সেই ভাবেই আমরা ফিরছিলাম। লক্ষ্য করলাম আমাদের রাস্তায় বিশেষ এক জায়গায় সেলিং চলছে। অদ্ভুতভাবে ঠিক একটা নির্দিষ্ট জায়গাতেই গোলা পড়ছে। আর সেখানদিয়েই আমাদের যেতে হবে। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ 'দাস'দা গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে বললেন, "তুই পিছনে বোস, আমি চালাবো" দাসদা নিজে ARV ইলেকট্রিশিয়ান হলেও খুব ভাল গাড়ি চালাতেন। আগের ড্রাইভার গোলা পড়ার ধরণ দেখে ভয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। দাসদা সেটা বুঝতে পেরে নিজে গাড়ির দায়িত্ব নিলেন। ঠিক যে জায়গায় গোলা পড়ছিল, ঠিক তার বাঁদিকে গাড়ি নিয়ে গেলেন। তারপর খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে ওই জায়গাটা পার করে খানিকটা দূরে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলেন। দুটো গোলা পড়ার মাঝের সময়টা হিসেবে করে ওই জায়গাটা পার করে দিলেন। তারপর বললেন, "যাক ঝামেলা আপাতত শেষ, রিলাক্স।" মনে মনে ভাবছিলাম আজকের মত ফাঁড়াটা কাটলো।

বাড়ির কথা অনেকসময় মনে পড়ে না। জোর করে মনে করতে হয়। জীবিত থাকার চিন্তায়। বাড়ির কথা মনে পড়ে যেত যখন 'উপাধ্যায়'-এর সাথে দেখা হত। ভদ্রলোক বিবাহিত, সংসার ছিল, ছেলে-মেয়ে ছিল। কোনো কারণে দেখা হলেই একই কথা – "যদি আমার কিছু হয়ে যায়, তাহলে ছেলে মেয়ের কি হবে ? আমার স্ত্রীর কি হবে ?" ঐসময় এসব কথা শুনতে মোটেই ভাল লাগত না। মনে মনে ভাবতাম কখন এই লোকটা যাবে।

আর একদিন tank location থেকে আমরা rear location এ ফিরছি। একটা জায়গায় আমাদের গাড়ি দাঁড় করানো হলো। তারপর দেখলাম পাশেই একটা বড় পেয়ারা বাগান। প্রচুর পেয়ারা পেকে আছে। গাড়িতে যে ক্যানভাস বালতি ছিল, সে বালতি ভরে পেয়ারা পাড়া হলো। আমরা ছজন ছিলাম, সকলে দু-তিনটে করে খেলাম। সকালে মুখ ধোয়া নেই,

খেতে ভালোও লাগছিল না এর বেশি। দু তিন বালতি পেয়ারা গাড়িতে ঢেলে দেওয়া হলো। নিজেদের জায়গায় ফিরে এসে সকলকে ওই পেয়ারা দেওয়া হল। খুব আনন্দ করে সকলে খেলো।

বাইশ-তেইশ দিন যুদ্ধ হয়েছিল। প্রতিদিনের কাজ প্রায় একই ছিল। রাতের অন্ধকারে ট্যাংক হারবারে এসে যার যা কাজ করে আবার আমরা ফিরে যেতাম আমাদের জায়গায়। ১৯৬৫ র আগস্টের ঘটনা তারিখ ঠিক থাকে মনে নেই। বোধহয় সাত-আট তারিখ হবে। ইতিমধ্যে বাড়ি থেকে আর দেবু (আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল দেবু)-র চিঠি পেয়েছি। বাড়িতে বাবা জানেন না আমি এখন কোথায় আছি। ছোটদা, নেদা আর দেবুকে জানিয়েছিলাম কোথায় এবং কি অবস্থায় আছি। রেডিওর খবর শুনে বাবা কিছু আন্দাজ করেছিলেন কিনা জানিনা। পরে শুনেছিলাম প্রতিদিনই একবার করে পোস্ট অফিসে যেতেন। আমার কোনো চিঠি পৌঁছেছে কিনা জানার জন্য। বিনা পয়সায় ফোর্সেস ইনল্যান্ড পাওয়া যেত। যখনই সময় পেতাম, লিখে DR (Dispatch Rider) এর কাছে দিয়ে দিতাম। তারা ফিল্ড পোস্ট অফিসে পৌঁছে দিত। যুদ্ধের সময় এভাবেই চিঠি পত্র আসা যাওয়া করত। একা থাকলে বা কোনো কাজ না থাকলে বাড়ির জন্য, বিশেষ করে বাবা-মায়ের জন্য ভীষণ মন খারাপ করত। দাদা, ছোটদিও চিঠি দিত। সকলকে সবসময় উত্তর দেবার সময় পেতাম না। এভাবেই দিন গুলো কাটছিলো। শুনেছিলাম যুদ্ধের সময় খাবার পাওয়া যায় না। ঘুমোনো যায় না। আমরা কিন্তু যুদ্ধের সময় প্রায় প্রতিদিনই গরম খাবার পেয়েছি। যুদ্ধের আগের চার পাঁচ দিন থেকে যুদ্ধ শেষের কয়েকদিন ঘুম হয়নি ভাল করে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, তার জন্য শরীরে কোনোরকম অসুবিধা হয়নি। বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। মানুষের ভয় বোধহয় যুদ্ধের সময় কিছুটা কেটে যায়।

একদিন সকালের দিকে আমরা হারবার থেকে ফিরছি। দেখলাম অর্ডন্যান্সের একটা গাড়ি আসছে। তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, SKT. Dutta কেমন আছে? (SKT : Store Keeper Technical)। Dutta হচ্ছে কানু দত্ত। আগেই বলেছি সে আমার গ্রামেরই ছেলে। অর্ডন্যান্সের গাড়ির ড্রাইভার বললে, দত্ত হাসপাতালে আছে। আমি আর ভাল করে জানতে চাইলাম না হাসপাতালে কেন ? কি হয়েছে ? আমি ধরে নিয়েছিলাম, যুদ্ধের সময় হাসপাতালে মানে নিশ্চয়ই বড় ধরণের কিছু হয়েছে। অন্য কেউ হলেও বোধহয় তাই মনে করত। পরে মনে হয়েছিল, আরো ভাল করে জানা দরকার ছিল। খুব মন খারাপ হয়ে গেল। এখন হাসপাতালে যেতেও পারব না ওর সাথে দেখা করতে। পরে 'সিজ ফায়ার' এর পর কানুর খবর নেবার জন্য আমায় একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। T.O. কে বললাম, যে আমার একটা ওয়ারলেস এর পার্টস দরকার। ওয়ার্কশপে যেতে হবে। আর ওয়ার্কশপে যেতে গেলে গাড়ি লাগবেই। উনি বিশ্বাস করে গাড়ি দিয়ে দিলেন। আর বললেন, খাকি ড্রেসে যেন না যাই। কারণ খাকি ড্রেসটা পাকিস্তানের ড্রেস। ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। যথা সময়ে গাড়ি নিয়ে ওয়ার্কশপে পৌঁছালাম। অর্ডন্যান্সের ষ্টোর ওয়ার্কশপের পাশেই। গিয়ে দেখি কানু দিব্যি রোদে চেয়ারে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম তার প্রচন্ড জ্বর হয়েছিল তাই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। ওদের ওখানে চা খেয়ে নিশ্চিন্ত মনে আমাদের জায়গায় ফিরে এলাম।

যুদ্ধ চলাকালীন ট্যাঙ্কের সাথে সাথে আমরা পাকিস্তানের ভেতরে গ্রামের মধ্যে ঢুকতে থাকছিলাম। সেরকমই এক গ্রামে এক বুড়ি একটা বাড়িতে রয়ে গিয়েছিল। ওখান থেকে পালিয়ে যাবার মতন শারীরিক ক্ষমতা ছিল না। আমরা যেদিন প্রথম দেখলাম, আমাদের দেখে সেই বুড়ি হাত জোড় করে বসে রইল ভয়ে। আমরা যদি ওকে মেরে দিই! ব্যাপারটা আমাদের অফিসারকে বলতে উনি নিজে দেখতে এলেন। দেখার পর ভারী মজাদার এক হুকুম দিলেন। আমাদের বললেন, "তোমরা সকাল থেকে যা যা খাও, এমন কি চা পর্যন্ত, সব ওই বুড়িকে পৌঁছে দিতে হবে। যতদিন বেঁচে থাকবে যেন খাবার পায়। প্রথম প্রথম আমাদের অবিশ্বাস করত। তারপর আমাদের বন্ধু বলে মনে করতে আরম্ভ করল। আমাদেরও মনে হতে লাগলো, আমরা অন্তত একজনকে খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। তাকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার সংসারে মোট কতজন লোক ছিল। সে যা হিসেবে দিয়েছিল তাতে যতদূর মনে পড়ে, জনা দশেকের মত লোকের হিসেবে ছিল। ওই বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে তাদের অসুবিধা হবে। বোঝা বাড়বে। তাই তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। হয়ত তার মধ্যে

নিজের ছেলেও আছে। দিন চার পাঁচ পরে আমরা সে গ্রাম ছেড়ে আরো এগিয়ে গেলাম। আমাদেরও ওই বুড়িকে ওখানেই ফেলে রেখে এগোতে হলো। মনটা সকলেরই ভারী হয়ে গেল। সকলেই বলত, কিজানি বুড়ি আর খাবার পাবে কিনা। হয়ত দিনের পর দিন না খেয়ে মরেই যাবে। শত্রুপক্ষের কোনো এক বুড়ির জন্য মন খারাপ হতে পারে সেইদিন বুঝলাম।

আবার একটা গ্রামে আমরা আশ্রয় নিলাম। ওখানে অনেক বাড়িঘর দেখলাম। সব ছেড়ে দিয়ে সবাই অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে। সীমান্তের দুদিকেরই গ্রামগুলোর একই ছবি। আমরাও এদিক ওদিক আশ্রয় নিচ্ছি ঠিকই কিন্তু রাত্রে ঠিক সময়ে ট্যাঙ্ক হারবারে পৌঁছে যাচ্ছি। ওখানে তো যেতেই হবে। কারণ পেট্রল, খাবার, কারো মেডিকেল এইড যদি লাগে। ওয়ারলেস যদি গন্ডগোল থাকে, গাড়ি বা ট্যাঙ্কের মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিকাল গন্ডগোল থাকে তাহলে rear team এর লোকেরাই তো রিপেয়ার করবে। ওই গ্রামের বাড়িঘর ঘুরে দেখলাম। প্রত্যেক বাড়িতেই বড় বড় মাটির জালা (বড় হাঁড়ি) বা টিনের পাত্রে সর্ষে, গম বা অন্য কোনো শস্য মজুদ করে রাখা আছে। আমাদের FRT team এর দাসদার প্রতিদিনের কাজ আবার ওই হাঁড়ি বা জালা গুলিকে লাঠি কিংবা পাথর ভেঙে শস্য নষ্ট করা। ভেঙে দেওয়ার পর মাটিতে ছড়িয়ে পড়ত ওই গম বা সর্ষে। ভাঙার সময় আমরা আপত্তি করলে দাসদা বেশ ক্ষোভের সাথে বলতেন, “তোমরা তো ভুক্তভোগী নও। আমরা দীর্ঘদিন যন্ত্রনা সহ্য করেছি।” আসলে দাসদা পূর্ববাংলার লোক। পূর্ববাংলার হিন্দুদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা প্রচন্ড অত্যাচার করত। এইসব কথা মনে করে দাসদা এসব করতেন বুঝতে পারতাম। কিন্তু এতে তো পারস্পরিক ক্ষোভ আরো বাড়বে। আমরা চাইতাম তারা ফিরে এলে আবার যেন তাদের সব কিছু পায়। কিন্তু কি করে হবে ? আমাদের বর্ডারের যারা সিভিলিয়ান তারাও ইতিমধ্যে গরু বা মহিষের গাড়ির কনভয় নিয়ে ওই এরিয়াতে চলে আসত সকালবেলা। আর ওখানকার কাঠ, ইঁট, মজুত শস্য বা আরও অন্য কোনো জিনিস ঐসব গাড়িতে ভোরে নিয়ে চলে যেত ভারতের মাটিতে। এইসব সবই চলত ভারতীয় সেনা অফিসারদের অনুমতি নিয়েই। আমরা শিয়ালকোট সেক্টরে আটত্রিশ কিলোমিটার জায়গা দখল করেছিলাম। এইসব দখল করা জায়গায় এরকম লুট চলত। পরে জেনেছিলাম আমাদের যে জায়গা অন্য সেক্টরে পাকিস্তান দখল করেছিল, তারাও একই পদ্ধতিতে লুট করত।

যুদ্ধ চলছে। ট্যাঙ্ক এক একটা জায়গা দখল করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরাও পিছনে পিছনে এগোচ্ছি। যাওয়া আসার পথে দেখলাম পাকিস্তানের কোনো লোক প্রাণভয়ে পালানোর সময় সম্ভবত গুলি লেগে হুমড়ি খেয়ে হাঁটু মুড়ে পড়ে গিয়ে মারা যায়। ওই হাঁটুমুড়ে বসা অবস্থায় ডেডবডিটা তিন-চারদিন আসা যাওয়ার পথে একই ভাবে দেখেছি। যুদ্ধ চলেছে। আরো কত মৃত্যু দেখব কে জানে ?

(চলবে)

Prasanta Chatterjee — 76 years. Retired from Indian army on 1978. Later worked at Indian postal service. Retired on 2001. Passionate footballer. Played for Indian army team. Stays at Gopalnagar, Kolaghat, East Midnapore, West Bengal, India.

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ২৬

শেষ যাকে ভালোবেসেছিলাম, সে জল
নদীতে যখন তখন অবগাহন
সঙ্গমস্নানে পবিত্র হতো মন
নদী রইলোনা, ছুটলো সাগরমুখে
সেখানেও কি সে দিন গুজরায় সুখে
কিছুদিন যেতে না যেতেই বাষ্পিত
আকাশ ঘুরে সে ফের নদীজলস্ফীত
আমাকে ঘিরে সে সুন্দর চঞ্চল

প্রথম প্রেমের স্বাদ এনেছিলো জল
কখনো সে নদী কখনো সাগর, মেঘে
স্বতোৎসারিত পবিত্র নির্মল
করে জীবনকে স্বচ্ছ অমরাবেগে

জলের অপর নাম জীবন না, পালি
শ্রেষ্ঠ রমণী পৃথিবীর, সে বাঙালি

সনেট ২৭

কার সাথে করো কবিতার আলোচনা
খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বারান্দাকোণে
কতো মাত্রায় 'সঙ্গম' একমনে ?
মদের মাত্রা কতো যার নেই গোনা ?
সঙ্গম কতো মাত্রায় হবে, সেটা
কে ঠিক করবে ? ঐ ব্যাটা বুড়ো ভাম ?
নোংরা পাজামা, বগলে মাসিক ঘাম —
মালটা কে ? — এই লাইনের কেউকেটা ?

কবিতা মারাও, আর যাই করো — শোনো
পেঁয়াজি করলে দেবো থাপ্পড় শালি
ভুলবোনা আঁতলেমি কান্নায় কোনো
বাড়ি চলো তুমি, দেখাচ্ছি মজা —

পালি, এমন কখনো বলেনা তোমার স্বামী ?
কী আশ্চর্য ! এতো ভালো নই আমি ।

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্‌সাল্‌টেন্সি কোম্পানির চিফ্‌ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ন কবি — প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ — যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস — একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা । গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা — খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন ।

রজত ভট্টাচার্য

অভিজ্ঞান-মালতী

পর্ব ৩

(পাঁচ)

বিপ্রদাসের শ্রাদ্ধ-শান্তি সবে মিটেছে। কানাইয়েরও শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পারলৌকিক কার্য কমলদাস এর আদেশে একই সাথে সমাপন হয়েছে। তিনি এক্ষেত্রে কোন কার্পণ্য করেন নি। তার স্ত্রী শয্যাশায়ী। তিনি নিজে ভগ্নহৃদয় হলেও তা বাইরে প্রকাশ করেন নি। তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু তিনিও এই আকস্মিক মর্মন্তুদ ঘটনার কার্য-কারণ-পরম্পরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী তার আছে। তার ক্ষতি হলে আনন্দ পাওয়ার লোকও নগরে বিস্তর আছে। বিপুল বৈভবের সাথে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বেশ কিছু শত্রু অর্জন করেছিলেন। কিন্তু বিপ্রদাস! সে তো সবেমাত্র ব্যবসায়ক্ষেত্রে পা রেখেছে। তার সঙ্গে কার শত্রুতা থাকতে পারে! হয়ত তাকে শাস্তি দেবার জন্য বিপ্রদাসকে হত্যা করা হয়েছে। নাহ, তাতে ব্যবসায়িক কোন লাভ নেই। তাহলে কি নারী ঘটিত কোন ব্যাপার ? বিপ্রর কি কোন গোপন প্রণয়ী ছিল ? তাই বা কি করে হয় ! সে একবছর ধরে বাইরে ছিল। চিন্তিত কমলদাস অস্থির ভাবে ঘরে পায়চারী করছিলেন। মদন এসে খবর দিল বীরভদ্র ও অভিজ্ঞান এসেছে। কমল দাস দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। অভিজ্ঞান অন্যমনস্ক হয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল। কয়েকদিন আগেই এখানে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর তার বন্ধু তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভয়াবহ পরিণতির দিকে। কমলদাস এসে অভিজ্ঞানের হাত ধরলেন। অভিজ্ঞান নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেল। কিন্তু তার আগেই কমলদাস সবলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। যে তীব্র আবেগ এতদিন ধরে তিনি গোপন রেখেছিলেন তা আর বাঁধ মানল না। তিনি হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। অভিজ্ঞান ও বীরভদ্র দুজনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই ভগ্নহৃদয় পিতাকে সান্ত্বনা বাক্য বলা মূঢ়তা। আবেগ প্রশমিত হলে কমলদাস বীরভদ্র ও অভিজ্ঞান কে নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন। তিনি মদনকে ডেকে আদেশ দিলেন কেউ যেন তাদের বিরক্ত না করে। গিন্নীমাকে কিছু বলার দরকার নেই। "বলত বাবা, ঠিক কি হয়েছিল, লজ্জা পেয়ে কিছু লুকিও না। আমার সবটা জানা দরকার" কমলদাস বললেন। অভিজ্ঞান আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। বীরভদ্র বলল "আসব ব্যবসায়ীকে আটক করেছিলাম। কিন্ত তার যুক্তি অমোঘ। সেই আসব অনেকেই খেয়েছে। আর কারো কিছু হয় নি। তাই তাকে আর আটকে রাখি নি। শুধু ওই বিশেষ পাত্রেই আলাদা করে বিষ মেশানো হয়েছিল।"

"কি বিষ ?" কমলদাস প্রশ্ন করলেন। "দন্ডপানিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, চেনা কোন বিষ নয়। স্নায়ু অবশ করে দেয় এমন কোন বিষ। সেই বিষ প্রচুর পরিমানে আসবে মেশান হয়েছিল। বিপ্রদাস ও কানাই দুজনেই একই বিষের শিকার। অভিজ্ঞান খুবই অল্প পরিমাণ আসব পান করেছিল তাও বেশিটাই বমি হয়ে বেরিয়ে যায়। তাই কোন রকমে রক্ষা পেয়েছে।" চিন্তিত কমলদাস অভিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা যখন বিপ্রর ঘরে ঢুকলে, তখন তো কাউকে দেখ নি। আসব তখন সেখানে রাখাই ছিল। কানাই হয়ত ওই একই আসব পান করেছিল, তারপর পাত্রটি ঘরে রেখে বেরিয়ে আসে ও পরে অসুস্থ বোধ করায় বিশ্রাম নিতে যায়। অথবা ..."। বীরভদ্র মাথা নেড়ে বললেন "তাতেও প্রশ্ন থেকে যায় বিষ কে মেশাল, কেন মেশাল আর আর সে বিষ পেল কোথা থেকে। আমি প্রতিটি ভৃত্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। সবাই অতিথি আপ্যায়ন ও পরিবেশনে ব্যস্ত ছিল। তার প্রচুর সাক্ষী আছে। ভিতরের মহলে ঢোকার অনুমতি ছিল শুধু কানাই আর মদনের।" কমলদাস বাধা দিয়ে বললেন "মদন আমার সাথে ছিল। আমার সাথে অতিথিদের আপ্যায়ন করা, পান দেওয়া ইত্যাদি টুকি টাকি নানান কাজে সে ব্যস্ত ছিল। ওকে নিয়ে আর টানাটানি করো না। এমনিতেই ও কাজ ছেড়ে দিতে চায়। কানাই মারা যাবার পর ওর আর মন টিকছেনা। তবে একটা কথা, এই ভোজ উপলক্ষ্যে আমায় বেশ কিছু কাজের লোক কে ভাড়া করতে হয়েছিল। সবাইকে আমি চিনি না। তাদের মধ্যে কেউ ..."

বীরভদ্র বললেন "প্রায় সবাইকে আমি প্রশ্ন করেছি। দু একজন ছাড়া সবাই স্থানীয় লোক। সন্দেহজনক কাউকে পাই নি। তবে চেষ্টা চলছে, দেখা যাক।" কমলদাস স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বীরভদ্রের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন "খবর চাই, যেখান থেকে হোক, যে ভাবে হোক। আপনি প্রচার করে দিন, যে হত্যাকারী সম্বন্ধে সঠিক খবর দিতে পারবে, তাকে একশ স্বর্ণ মূদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে। আমার একমাত্র সন্তান কে যে হত্যা করেছে, সে যেন নিষ্কৃতি না পায়।" কথা আর বেশি এগোল না। কমলদাসকে আরেকবার প্রণাম জানিয়ে বীরভদ্র ও অভিজ্ঞান বিদায় নিল।

অভিজ্ঞান বাড়ি থেকে বেরোবার অনুমতি আজই সবে পেয়েছে। দন্ডপানির কড়া নিষেধ আছে সে যেন বেশি পরিশ্রম না করে। অভিজ্ঞান আগেই কমলদাসের কাছে আসতে চেয়েছিল কিন্তু মালতীর তীব্র বিরোধিতা এবং দন্ডপানির নিষেধাজ্ঞা সে এড়াতে পারেনি। সে মনে মনে অনেক চিন্তা করেও কোন সমাধান সূত্র খুঁজে পায় নি। বিপ্রদাসকে হত্যা করার বাহ্যত কোন কারণ নেই। যেই হত্যাকারী হোক না কেন সে জানত দুজন মাত্র ব্যক্তি আসব পান করবে। কারণ চষক মাত্র দুটি রাখা ছিল। সে জানত বিপ্রদাস আর অভিজ্ঞান আসব পান করবে এবং বিপ্রদাস ব্যাপারটি গোপন রাখতে চায়। বিপ্রদাসের এই কিশোরসুলভ চপলতার কথা জানত একমাত্র কানাই। সেও মারা গেছে বিষক্রিয়ায়। হতে পারে কানাই নিজেও গোপনে একটু আসব চেখে দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু যদি আর কেউ বিপ্রদাসের পরিকল্পনার কথা নাই জেনে থাকে তবে বিষ কি করে মেশানো হলো ? কানাই হয়ত কাউকে বলেছিল। কাকে বলতে পারে ? মদন কে ? মদন নিজের মামাকে ... তাছাড়া সে সর্বদা কমলদাসের সঙ্গে ছিল। তাহলে ... প্রতিবারই অভিজ্ঞানের চিন্তার স্রোত এই অবধি এসে থমকে যায়। সমস্ত ঘটনাটি প্রহেলিকার মত লাগে। বীরভদ্র আর সে কমলদাসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিক দূর চলে এসেছে। দুজনের কারোর মুখেই কথা নেই। অভিজ্ঞান খেয়াল করল তারা তার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। এই কদিন বাড়িতে মালতীর কঠিন শাসনে থেকে সে উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। তাই চট করে বাড়ি ফেরার ইচ্ছে তার ছিলনা। সে বীরভদ্রের দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল "এখনই বাড়ি ফিরব না। একটু নদীর ঘাটে বসি। কিছুক্ষণ পরে না হয় ...।" তার বাক্য শেষ হবার আগেই বীরভদ্র সবেগে মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিল সে মালতীকে কথা দিয়ে এসেছে অভিজ্ঞানকে নিয়ে সোজা বাড়ি ফিরবে। "তাছাড়া আমার অন্য কাজ আছে, একবার দন্ডপানির সঙ্গে দেখা করা দরকার।" অভিজ্ঞান এই সুযোগ ছাড়ল না। দন্ডপানির কাছে গেলে মালিনী সম্ভবতঃ কিছু বলবে না। বীরভদ্রের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে অবাধ্য শিশুর মত বীরভদ্রের সংগ ছাড়ল না।

দন্ডপানি একটি জলচৌকির উপর তালপাতার পুঁথি বিছিয়ে নিবিষ্ট মনে পড়ছিলেন। অভিজ্ঞান আর বীরভদ্রের পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন। তারপর হাসিমুখে তিনি সামনে রাখা তালপাতার পাটির দিকে নির্দেশ করলেন। বীরভদ্র ও অভিজ্ঞান পাটি পেতে তার সামনে বসল। দন্ডপানি আজ আর অভিজ্ঞানের স্বাস্থ্য নিয়ে কোন প্রশ্ন করলেন না। তিনি একঝলক তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন অভিজ্ঞান সুস্থ। বীরভদ্র জিজ্ঞাসা করলেন "কিছু বুঝলেন কী বিষ ?" দন্ডপানি এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কতকটা আত্মগত ভাবে বললেন "খেয়াল রাখতে হবে একই বিষ ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন ফল প্রদান করেছে। এর জন্য অবশ্যই বিষের পরিমানের তারতম্য দায়ী। বিপ্রদাস আর কানাই একটু শব্দ অবধি করেনি। তাদের মৃত্যু হয়েছে দ্রুত ও নিঃশব্দ। অথচ অভিজ্ঞানের হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠেছিল, পায়ের মাংসপেশিতে শক্তি ছিল না। তাছাড়া বেশির ভাগ বিষ বমি হয়ে বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় সে আচ্ছন্ন বা বলা চলে অচেতন ছিল। শুধু পরিমানের তফাতে এত তারতম্য।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন "এদেশে যে বিষ পাওয়া যায় সেগুলির কোনোটার সাথেই এই লক্ষনগুলি মেলে না। তবে প্রাচীন বিষদ বৈদ্যেরা একটি উদ্ভিদের কথা বলে গেছেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তার নাম 'সূচি', তার মূল, পাতা বা ফলের থেকে তৈরি বিষের প্রতিক্রিয়ার সাথে এই লক্ষনগুলি মেলে। এই উদ্ভিদ পাওয়া যায় হিমালয় পর্বতে আর সুদূর প্রাচ্য দেশে।" এই অবধি বলে তিনি বীরভদ্রের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন।

বীরভদ্র কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন "আপনি কি প্রাচ্য দেশীয় বণিকদের দিকে ইঙ্গিত করছেন ? কিন্তু তাদের কি স্বার্থ থাকতে পারে ? তাছাড়া তাদের আমি নগরে ঢুকতে দিইনি। তারা কমলদাসের ঘরে ঢুকবে কেমন করে ! এমনকি তারা এই ঘটনার কয়েকদিন আগে তাদের তাবু গুটিয়ে বিদায় নিয়েছে।" দন্ডপানি বললেন "তাদের তুমি বাণিজ্য করতে দাওনি, তাই

তারা প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে থাকতে পারে। কমলদাস বিখ্যাত ব্যক্তি। তাই তাকে আঘাত করলে নগরবাসীর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আর বিষ প্রয়োগ করতে তো নিজে আসার প্রয়োজন নেই। একজন বিশ্বস্ত সহকারী প্রয়োজন। যাকগে, ওসব চিন্তা তোমার। আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তোমায় বললাম।"

দন্ডপানির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বীরভদ্র ও অভিজ্ঞান ফিরে চলল অভিজ্ঞানের বাড়ির দিকে। অভিজ্ঞানকে বীরভদ্র কিছুতেই একা ছাড়বেনা। তাই অগত্যা বাধ্য ছেলের মত অভিজ্ঞানকে বাড়ি ফিরে আসতে হল।

বাড়িতে ঢুকে অভিজ্ঞান দেখে শ্বশুরমশাই এসেছেন। লোকমুখে তিনি খবর পেয়েছেন অভিজ্ঞানের জীবন বিপন্ন। তৎক্ষণাৎ তিনি রওয়ানা হয়ে দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছেছেন। এবং তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এসেছেন যে জামাই ও মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরবেন। শ্বাশুড়িমাতা কেঁদে কেটে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের না দেখলে তিনি মারা যাবেন, অতএব ....।

অভিজ্ঞান নানা ভাবে বুঝিয়েও নিষ্কৃতি পেল না। তাছাড়া সে বেশ বুঝতে পারছিল মালতীর এতে প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে। তাই যেতে হল।

(ছয়)

আজ অমাবস্যা। ভাগীরথীর জল শান্ত, প্রায় নিস্তরঙ্গ। নগরের প্রান্তে নদীর ঘাটে মদন ও আরেকজন যাত্রী নৌকায় বসে ছিল। মাঝি একটু তফাতে ঘাটে বসে আছে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর মদন অধৈর্য হয়ে মাঝিকে বলল "অনেকক্ষণ তো হলো, এবার নৌকা ছাড়ো। ওদিকে জোয়ার আসার তো সময় হল।" মাঝি এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। মদনের সঙ্গী যাত্রী মদনের পূর্বপরিচিত। এই নৌকাতেই যাতায়াত করে। সে অলস ভঙ্গিতে হাই তুলতে তুলতে বলল "বেনে অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে, শুনেছিস ? খালি খবর দিলেই হবে। হত্যাকারীকে ধরার প্রয়োজন নেই। নগর জুড়ে হৈ হৈ পড়ে গেছে।" মদন সবই জানত। সে দরজায় আড়ি পেতে সব শুনেছে। সেই থেকে তার মনে শান্তি নেই। সে প্রতিটি পদক্ষেপ খুব সাবধানে ফেলেছে। তবুও তার মনে স্বস্তি নেই। ধরা পড়লে অবধারিত মৃত্যু এবং সে মৃত্যু হবে অতীব যন্ত্রণাদায়ক। হয়ত কেউ দেখেছে তাকে বিষ মেশাতে। যে দেখেছে সে হয়ত আগে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু এখন তলিয়ে ভাববে। তারপর .... মদন আর ভাবতে পারে না। বহুদিন পরে সে সুখের মুখ দেখেছে। কঠিন দারিদ্র আর চির রুগ্ন স্ত্রী তার জীবনকে বিষবৎ করে তুলেছিল। ভালবাসার আর ভাল থাকার ইচ্ছেটা প্রায় মরেই গিয়েছিল। বহুদিন পরে আবার সেই ইচ্ছেগুলি অঙ্কুরিত হয়েছে। তার কৃত ভয়ঙ্কর অপরাধের স্মৃতি এই সুখানুভূতি কে চেপে রাখতে পারেনি। বেঁচে থাকা তার কাছে ছিল দিন গত পাপক্ষয় মাত্র।

মদন জাতে তৌলিক অর্থাৎ সুপারী ব্যবসায়ী। পিতৃদত্ত বসত ভিটে ছাড়া আর কিছুই তার নেই। আত্মীয়-পরিজনও কেউ বিশেষ নেই। সুজলা-সুফলা বঙ্গভূমির অপরিমিত দাক্ষিণ্যে কোন রকমে তার দিন চলে যাচ্ছিল। গ্রামের দু-চারজন শুভানুধ্যয়ীর সাহায্যে সে ছোট খাট একটি ব্যবসা শুরু করেছিল। বাকি তৌলিকদের থেকে ধারে সুপারী নিয়ে নগরে বিক্রি করা। সামান্য লাভ থাকত আর তাতেই তার খাওয়া-পরা চলে যেত। এই সময়ই সে বিয়ে করে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তার স্ত্রী একটি মৃত সন্তান প্রসব করে শয্যা গ্রহন করল। মদন প্রথম কিছুদিন ঘরে-বাইরে তাল রেখে চলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিধি বাম। তার স্ত্রীর অসুস্থতা ক্রমাগত বাড়তে থাকল। এদিকে কাজে কামাই হওয়ায় বাজারে দেনার পরিমান দ্রুত বাড়তে লাগল। যে টুকু সহযোগিতা সে ব্যবসার শুরুতে পেয়েছিল তা বন্ধ হল। এই সময় হঠাৎই কানাইয়ের সঙ্গে দেখা। কানাই সম্পর্কে মদনের মামা। মদনের দুরবস্থার কথা জানতে পেরে কানাই কমলদাসের স্ত্রী কে বলে মদনকে চাকরের কাজে বহাল করে। কোনোরকমে গ্রাসাচ্ছদনের একটা ব্যবস্থা।

গত বছর শিবরাত্রিতে মদন কাজ থেকে একটু আগেই ছুটি পেয়েছিল। সবে সে ঘাটের রাস্তা ধরেছে, গ্রাম সম্পর্কের এক দাদার সঙ্গে দেখা। দাদাটি রসিক ব্যক্তি। হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল নগরের শেষ প্রান্তের শুঁড়িবাড়িতে। শুঁড়ির নাম

ভূরিপাল। ব্যবহারটি ভারি সুন্দর। দাদাটি উশখুশ করছিল, মদিরায় তার মন নেই। দুপাত্র শেষ করে মদন তখন বেশ ফূর্তি অনুভব করছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তখনই আলোকবর্তিকা হাতে একটি মেয়ে প্রবেশ করল। প্রগাঢ় যৌবনা, মুখে স্মিত হাসি আর চোখে বিলোল কটাক্ষ। মদন হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। প্রগলভ হেসে দাদা তার গা টিপে ভুরিপালের দিকে ইশারা করে বলল "শুঁড়ির বউ, একে দেখতেই আসা"। তারপর থেকে মদন সময় পেলেই সেই বিশেষ শৌণ্ডিকালয়টিতে যেত। প্রতিবারই বাড়ি ফিরত চূড়ান্ত হতাশা নিয়ে। তবু আবারো যেত।

ভূরিপালের বধ-বন্ধন ও তার সঙ্গে জড়িত কাহিনী নগরে বিরাট আলোড়ন ফেলেছিল। সদালাপী ও আপাতনিরীহ একব্যক্তি যে ভিতরে ভিতরে এতদূর ক্রুরকর্মা হতে পারে তা নগরবাসী আগে ভাবতেও পারেনি। ভুরিপালের মৃত্যুদন্ড হয়েছিল। সে মরে বেঁচেছে। তার স্ত্রী সনকার শাস্তি আরো ভয়ানক। তার নাক-কান কেটে, প্রহার করতে করতে নগর থেকে বহুদূরে নদীর তীরে ফেলে রেখে আসা হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা নগরে ফিরে এসে জানাল ও বেটি মরেছে। সনকাকে আর দেখা যায় নি।

সে রাতে এক পক্ষ আগে কাজ সেরে মদন বাড়ি ফিরছিল। রাত হয়েছে। আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ। চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। মদনের দেহ-মন দুইই অবসন্ন। বাঁশের বেড়ার আগড় খুলে ভিতরে ঢুকে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। ঘরের দরজার কপাট ভেজান। মদন দরজা ফাঁক করে দেখল তার স্ত্রী সতী শুয়ে আছে। খুব খেয়াল করলে বোঝা যায় তার শ্বাস পড়ছে। হাতের পুঁটুলি নামিয়ে রেখে ঘরের কোন থেকে মাটির কলসীটি তুলে নিয়ে মদন বেরিয়ে এল। জল ভরতে যেতে হবে নদীতে। সতী আজকেও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। ওঝা, বদ্যি, তুক-তাক, মানত কোনটাই সে বাদ রাখেনি। কিছুতেই কিছু হলো না। নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে দিতে মদন ঘাটে পৌঁছল। জল ভরা শেষ করে কলসী মাটিতে নামিয়ে রেখে সে ঘাটে বসল। তার অবসন্ন মস্তিস্ক পরিত্রানের কোন উপায় না পেয়ে বারবার ভাগ্যকে দোষারোপ করছিল। হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে সে চমকে উঠে দাঁড়াল। আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা একটি নারী মূর্তি প্রেতের মত তার থেকে হাত দশেক দূরে এসে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল মদন। চারিদিকে জনমানুষের চিহ্ন অবধি নেই। আতঙ্কে তার বাকরোধ হয়ে গেল। সে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল। নারী মূর্তি কিন্ত আর এগোল না। দূর থেকেই ক্ষীণ স্বরে বলে উঠল "ভয় পেওনা। আমি মানুষ। নগরে যাচ্ছিলাম। নৌকা পাই নি। তাই আটকা পড়েছি। সারাদিন কিছু খাই নি। আমায় একটু খেতে দেবে ? যা হোক কিছু ..." মদন কিছুটা আশ্বস্ত হল। কথাবার্তা তো মানুষের মতই। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল "খাবার তো এখানে কিছু নেই। আমার বাড়ি সামনে। যদি বাড়িতে আসো, দিতে পারি।" কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নারী মূর্তি বলল "আমি বাড়িতে ঢুকব না, তোমায় বাইরে খাবার এনে দিতে হবে।" মদন কথা না বাড়িয়ে কলসী হাতে তুলে নিয়ে বলল "আমার পিছু পিছু এস।" বাড়ি পৌঁছে মদন ঘরে কলসী নামিয়ে রাখল। সতী তখনো নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। মদন শিকেতে ঝোলান হাঁড়ি থেকে খানিকটা মুড়ি আর গুড় বার করে নিয়ে একটি ধামায় রাখল। তারপর ঘটিতে জল গড়িয়ে ধামা নিয়ে ঘরের বাইরে বের হল। নারীমূর্তি সোৎসাহে মুড়ির ধামা হাতে নিয়ে গোগ্রাসে খেতে লাগল। মদন হাত দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তার খাওয়া দেখছিল। তীব্র জ্যোৎস্নায় চারিদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এক ধামা মুড়ি শেষ হতে বেশি সময় লাগল না। মুড়ি শেষ করে নারীমূর্তি মাথা পিছনে হেলিয়ে ঘটি থেকে ঢক ঢক করে জল খেতে লাগল।

তার মুখের অবগুণ্ঠন সরে গেছে। মদনের মুখ থেকে একটি শীৎকারের মত শব্দ বেরোল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নারী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দিল। মদন মৃদু স্বরে বলল "আমি তোমায় চিনেছি। তুমি সনকা। ভয় পেওনা। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।"

মাঝি এতক্ষণে নৌকা ছেড়েছে। মদন নিজের চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল। বাকি দুজন যাত্রী নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে কথা বলছে। তাদের কথা মদনের কানে আসছে না। পালাতে হবে। এখানে আর না। যত দূরে সম্ভব চলে যেতে

হবে। এমন জায়গায় যেখানে কেউ তাদের, তাকে আর সনকাকে, চিনবে না। কিন্ত পাথেয় ? পালাতে গেলে অর্থ লাগবে। সে প্রায় কপর্দক শূন্য। মদন মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ভাবতে লাগল।

নৌকা ঘাটে ভিড়লে বাকি যাত্রীদের সঙ্গে মাঝিও নেমে এল। নৌকা ঘাটের সাথে শক্ত করে বেঁধে সেও বাকি দুই যাত্রীদের সঙ্গে চলা শুরু করল। মদন নিজের রাস্তায় চলতে চলতে শুনতে পেল মাঝি বলছে আজ রাতে সে তার সম্বন্ধীর বাড়িতে থাকবে। সেখানে অষ্টপ্রহর হরিনাম হচ্ছে।

আগড় খুলে বাড়িতে ঢুকে মদন দেখল উঠোন ঝকঝক করছে। একটি পাতাও পরে নেই। ঘরের দাওয়ায় ঘটিতে পা ধোবার জল আর দড়িতে গামছা রাখা। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। ভেজান দরজা নিঃশব্দে খুলে মদন দেখল সনকা দরজার দিকে পিছন ফিরে মাটিতে বসে একমনে কাঁথা সেলাই করছে। প্রদীপের আলো তার পিঠের ওপর ছড়িয়ে থাকা একঢাল নিকষ কৃষ্ণ চুলের ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ তৈরি করেছে। এতদিনে তার সংসার যেন পূর্ণতা পেয়েছে। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মদন সনকার পাশে এসে বসল। সনকা কাঁথা সরিয়ে রেখে হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলল "ভাত রেঁধে রেখেছি। সাথে কলমী শাক ভাজা আর আমরুল পাতার টক। আমি ভাত বেড়ে দিচ্ছি। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও"। মদন উঠলো না, কতকটা আত্মগত ভাবে বলতে শুরু করল আজ সে কি শুনেছে। খালি অভিজ্ঞান যে বেঁচে আছে সে কথা সে বলল না। মদনের কথা বলা শেষ হলে সনকা বলল "উপায় আছে, ওরা শুঁড়িকে হত্যা করেছে কিন্তু কিছুতেই তাকে দিয়ে বলাতে পারেনি ধন-রত্ন কোথায় আছে। আমি জানি। আমায় নিয়ে চল। আমি তোমায় দেখিয়ে দেব। এখনই চল।" মদনের মনে পড়ল আজ মাঝি ঘাটে নৌকা বেঁধে রেখেছে। আজ অমাবস্যা। কেউ তাদের দেখবে না। এই সুযোগ। সে সনকার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল।

(সাত)

ভিক্ষু ব্রহ্মধবজ ধীর পায়ে সংঘের প্রধান ফটকের দিকে চললেন। দেববল ও ভদ্রপাল অনুগমন করছিল, তিনি তাদের হাত নেড়ে বিদায় দিলেন। দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে। ভিক্ষুরা যে যার মত পুঁথি নকল করার কাজে ব্যস্ত। ব্রহ্মধবজ সংঘের বাইরে পর্ণ কুটিরের সামনে দাঁড়ালেন। মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে তিনি ডাক দিলেন "বেণুর মা, আছ নাকি ? কোথায় গেলে ?" ডাক শুনে একজন মধ্যবয়স্কা কুটিরের বাইরে এসে দাঁড়াল এবং সসম্ভ্রমে করজোড়ে ব্রহ্মধবজকে প্রণাম জানাল। ব্রহ্মধবজ হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার রুগী কেমন আছে ?" "আজ্ঞে ভাল, এখনও খুবই দুর্বল। তবে উন্নতি হচ্ছে।" ইতিমধ্যে কুটিরের ভিতর থেকে শ্যামবর্ণা তরুণী ধীর পায়ে বেরিয়ে ব্রহ্মধবজ কে আভূমি প্রণতি জানাল। স্মিত হেসে ব্রহ্মধবজ বললেন "স্বস্তি। তুমি হাঁটা চলা আরম্ভ করেছ দেখছি, খুব ভাল। সবই পরমকারুনিকের ইচ্ছা। তা মা, তোমার নামটা আমার জানা হয়নি।"

তরুণী মাটির দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে উত্তর দিল "আমার নাম সতী।" ইতিমধ্যে বেণুর মা বেতের তৈরি মোড়া এনে রেখেছে। ব্রহ্মধবজ তাতে বসলেন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তে সতীকে দেখছিলেন। মুমূর্ষু এক নারীকে তিনি নদী থেকে তুলে এনেছিলেন। কয়েকদিনের সেবা, যত্নে তার মধ্যে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। সে যত্ন করে চুল বেঁধেছে। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে, পায়ে আলতা। কৃশকায়, কিন্তু প্রাণবন্ত। তিনি বললেন "সতী! বাঃ! খুব সুন্দর নাম। তা, মা তোমার বাড়ি কোথায় ? কি হয়েছিল তোমার ?" মাটির দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে সতী পূর্বকথা বলতে আরম্ভ করল। ব্রহ্মধবজ মন দিয়ে শুনলেন। মাঝে মধ্যে দু-চারটি প্রশ্ন করলেন। সতী নিঃসংকোচে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিল। সব শোনার পরে ব্রহ্মধবজ ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর স্মিত হেসে বললেন "আজ উঠি, কাজ আছে। পরে আবার আসব।" সতী আবার প্রণাম করে বলল "ঠাকুর, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আর একটু দয়া করুন। আমি আমার শ্বশুর বাড়ি ফিরে যেতে চাই। আমায় অনুমতি দিন।" ব্রহ্মধবজ মুহূর্তকাল চিন্তা করে বললেন "তুমি এখনও দুর্বল, আর কটা দিন যাক। তারপর আমি ব্যবস্থা করে দেব।" তিনি আর দাঁড়ালেন না।

সংঘে ফিরে ব্রহ্মধবজ নিজের ঘরে পায়চারি করছিলেন। সতী যা বলেছে তার প্রতিটি কথা তিনি বিশ্বাস করেছেন। রাত্রে তার স্বামীর হাত থেকে ওষুধ খাওয়ার পর তার আর কিছু মনে নেই। অর্থাৎ যেটা সতী পান করেছিল, সেটা ওষুধ নয় বিষ। তীব্র শক্তির বিষ। কিন্তু আশ্চর্য এই বিষের প্রভাব।! সতীর বহুদিনের ব্যাধি এই বিষের প্রভাবে উপশম হয়েছে। সে নবজীবন লাভ করেছে। অপরদিকে তার স্বামী তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। সে সম্ভবতঃ ভেবেছিল সতী মারা গেছে। এমত অবস্থায় সতীকে ফেরত পাঠানোর অর্থ পুনরায় তার জীবন বিপন্ন করা। কিন্ত তাকে দীর্ঘদিন এখানে রাখাও সম্ভব নয়। তাছাড়া সে নিজেও ফিরে যেতে চায়। এমতাবস্থায় ...ব্রহ্মধবজ খাগের কলম, দোয়াত ও তালপাতার পাটি নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন।

দন্ডপানি রুগী দেখতে ব্যস্ত ছিলেন। ভৃত্য এসে খবর দিল একজন শ্রমন এসেছেন, জরুরী প্রয়োজন, দেখা করতে চাইছেন। দন্ডপানি রুগীকে মকরধ্বজ খাওয়ার নিয়ম বোঝাচ্ছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন "আসতে বল।" মুন্ডিত শির শ্রমন সামনে এসে দাঁড়ালে তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। শ্রমন করজোড়ে অভিবাদন করে বলল "আমি দেববল। পিপুলবন সংঘ থেকে আসছি। সংঘপ্রধান দেবপাদ ব্রহ্মধবজ আপনার জন্য এই পত্রটি পাঠিয়েছেন।" দন্ডপানি পত্রটি হাতে নিয়ে দ্রুত পড়ে ফেললেন। তারপর নতমস্তকে খানিক্ষণ চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলেন "কেমন আছেন ব্রহ্মধবজ ? বহুদিন দেখা হয়নি।" দেববল সবিনয়ে জানাল ব্রহ্মধবজ ভাল আছেন। দন্ডপানি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন "আপনি নিশ্চয় পথশ্রমে ক্লান্ত, আপনার জলপানের ব্যবস্থা করছি, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি পত্রের উত্তর লিখে রাখছি, নিয়ে যাবেন।" দন্ডপানি এবার ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে বললেন "দৌড়ে যা, বীরভদ্রকে খবর দে। বল এখনই আসতে। ভিতরে খবর দিয়ে যাস, অতিথি এসেছে, জলপানের ব্যবস্থা করবে।"

বেলা দ্বিপ্রহরে ব্রহ্মধবজ নিজের ঘরে বসে প্রজ্ঞাপারমিতার একটি খন্ড অধ্যয়ন করছিলেন। কিন্তু তার মন বসছিল না। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। অথচ বার্ধক্যে এসে তিনি হঠাৎই বাৎসল্য রস অনুভব করছেন। সতীকে দেখে থেকে তার মনে হচ্ছে আহা, তার যদি এমন একটি মেয়ে থাকত ! যতবার দৃঢ়তার সাথে তার মনকে সংযত করছেন, ততবার সতীর মুখ তার মনে পড়ে যাচ্ছে। নিজের মনকে তীব্র ভর্ৎসনা করে তিনি পুঁথিতে পুনরায় মনোনিবেশ করতে যাবেন, দরজায় একটি ছায়া পড়ল। তিনি মুখ তুলে দেখলেন দেববল দাঁড়িয়ে আছে। দেববল আর অনুমতির অপেক্ষা না করে ভিতরে ঢুকে ব্রহ্মধবজকে প্রণাম করল আর একটি পত্র বার করে তার হাতে দিল। লাল কাপড়ে মোড়া একটি মাত্র তাল পাতা। ব্রহ্মধবজ দ্রুত পত্রটি পড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দেববলের দিকে তাকিয়ে বললেন "তোমায় আবার বেরোতে হবে, তৈরি হও, ভদ্রপাল তোমার সঙ্গে যাবে।"

সতী কুটিরের দাওয়ায় বসে আনমনে সামনের পিপুল গাছটির দিকে চেয়ে ছিল। দূর থেকে ব্রহ্মধবজ, দেববল ও ভদ্রপাল কে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। ব্রহ্মধবজ উঠোনে পা রাখলে সে সসম্ভ্রমে প্রণাম জানাল। ব্রহ্মধবজ হাত তুলে বললেন "সতী মা, তোমার খাওয়া হয়েছে ?" সতী মাথা নেড়ে জানাল হয়েছে। ব্রহ্মধবজ বললেন "ভাল, তোমায় এখনই বেরোতে হবে। তোমার একবার নগরে যাওয়া প্রয়োজন। আমি গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। দেববল ও ভদ্রপাল তোমার সাথে যাবে। এখনই বেরোলে সন্ধ্যার সময় পৌঁছতে পারবে। নগরের প্রধান বৈদ্য শ্রীদন্ডপানি আমার পূর্বাশ্রমের বন্ধু, তুমি তার বাড়িতে যাবে। আর একটা কথা মা ...." এই পর্যন্ত বলে ব্রহ্মধবজ থামলেন, মনের ভাব গুছিয়ে নিয়ে আবার শুরু করলেন "জীবন-মৃত্যু বুদ্ধের ইচ্ছা, তিনি আমার হাত দিয়ে তোমায় পুনর্জ্জীবন দান করেছেন। সেই দিক থেকে আমি তোমার পিতৃস্থানীয়। মনে রেখ নগরে যাই ঘটুক না কেন, তোমার এই নবলব্ধ বৃদ্ধ পিতা সর্বদা তোমার অপেক্ষায় থাকবে আর এই কুটিরের দ্বার সর্বদা তোমার জন্য খোলা থাকবে। বাকি বুদ্ধের ইচ্ছা।" কথা শেষ হলে ব্রহ্মধবজ আর দাঁড়ালেন না, দ্রুত পায়ে সংঘের দিকে ফিরে চললেন।

(আট)

দ্বিপ্রহরে খাওয়া বেশ ভালোই হয়েছে। শ্বাশুড়ির হাতের রান্নাটি বেশ ভাল। পান-সুপারি মুখে দিয়ে অভিজ্ঞান বেশ একটু তৃপ্তিজনক উৎফুল্লতা অনুভব করল। জীবনে শোক-তাপ যেমন আছে, তেমনই পাকা রুইয়ের ঝাল আর ঘন দুধের পায়েসও আছে। দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমোলে শরীর রসস্থ হয়। গায়ে উড়নিটি জড়িয়ে অভিজ্ঞান বেরল। মালতী দেখেও কিছু বলল না। তাদের গ্রামে আসার পর থেকে তার মন থেকে বিপদের আশঙ্কা অদৃশ্য হয়েছে। ধীর পায়ে খানিকদূর হেঁটে অভিজ্ঞান নদীর ঘাটে উপস্থিত হল। বেশিদিন আগেকার কথা নয় যখন মালতী আর সনকার সাথে তার এখানেই দেখা হয়েছিল।

ঘাটের উল্টো দিকে পায়ে চলা রাস্তা ঝোপ-ঝাড় আর বড় গাছের পাশ কাটিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে। অভিজ্ঞান সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। রাস্তাটি ছায়াচ্ছন্ন, রোদের তীব্রতা নেই কিন্তু আলো আছে। অভিজ্ঞানের মনে পড়ল এখানেই ভূরিপালকে হাতে নাতে ধরা হয়েছিল। তার বাড়িও খুব কাছেই। ভূরিপাল ধরা পড়ার পরেও অপরাধ স্বীকার করেনি। তার বক্তব্য ছিল হরিদাস মদ্যপ অবস্থায় পড়ে গিয়ে মারা গেছে। কৃষ্ণাপ্পা'র আংটি তার কাছে কি করে এল জানতে চাইলে সে বলেছিল শুঁড়িখানার মেঝেতে সে ওটা কুড়িয়ে পেয়েছিল। বাকি লুণ্ঠিত সামগ্রী, বিশেষ করে হরিদাস কর্মচারীদের বেতন বাবদ যে কটি মূদ্রা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল, তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। কিন্তু অভিজ্ঞান সাক্ষী দেবার পর মহামন্ত্রী ও নগর প্রধানরা ভুরিপালের আর কোন কথা শুনলেন না। তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হল। সনকা ভূরিপালের আদর্শ স্ত্রী। সেও অপরাধ স্বীকার করেনি। কিন্তু মহামন্ত্রী একজন স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দিতে রাজি হননি। তাকে নাক-কান কেটে মারতে মারতে নগর থেকে দূরে নদীর ধারে অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে আসা হয়। দন্ড শুনে ভূরিপাল চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছিল। সনকা কিন্তু কাঁদেনি। জিঘাংসা ভরা দুটি চোখ দিয়ে সে এক দৃষ্টে অভিজ্ঞানের দিকে তাকিয়ে ছিল। এতদিন পরেও অভিজ্ঞান সেই তীব্র ঘৃণাপূর্ণ চাউনির কথা ভেবে শিউরে উঠল। হয়ত সনকা আজও বেঁচে আছে। নিভৃতে নিয়ত তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার পথ খুঁজছে। ভূরিপাল শত অত্যাচারের পরেও বলেনি লুণ্ঠিত সামগ্রী সে কোথায় লুকিয়েছে। বীরভদ্র ও তার লোকেরা বিস্তর চেষ্টা করেছিল খুঁজে বার করার কিন্তু পারেনি। লুকোন ধনের কথা জানা-জানি হবার পর বহু ভাগ্যান্বেষী একাধিক বার চেষ্টা করেছে তা খুঁজে বার করার। কিন্তু জনশ্রুতি, এখন অবধি কেউ সফল হয় নি। অভিজ্ঞান আগে কখন ভূরিপালের বাড়ি আসেনি। আজ তার দুর্নিবার কৌতূহল হল জায়গাটি দেখবার। সে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

খানিকদূর এগোতেই মাটির পথ এসে একটি ভগ্ন প্রায় বাড়ির উঠোনে এসে শেষ হল। একটি বড় কুটিরের পিছনে ছোট ছোট দুটি কুটির। বড় কুটিরটিতে শুঁড়িখানা চলত। ছোট কুটিরে ভূরিপাল আর সনকা থাকত। অভিজ্ঞান দেখল জায়গায় জায়গায় মাটি খোঁড়া হয়েছে। ঘরের চাল থেকে খড় সরিয়ে খোঁজা হয়েছে। এদিকে সেদিকে ভাঙা হাঁড়িকুড়ি ছড়ানো। এমনকি বাঁশের খুঁটি অবধি ফেড়ে দেখা হয়েছে। অভিজ্ঞান বড় ঘরটিতে ঢুকল। ভাঙা পাত্র, বোতল ইত্যাদি ছড়ান। এর মধ্যেই গোটা ঘর জুড়ে মাকড়শারা জাল বুনেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভিজ্ঞান বেরিয়ে এল। ভূরিপাল এমন কোথাও এই ধন লুকিয়েছে যেখানে সাধারণ লোকে কিছু লুকোয়না। উঠোন জুড়ে শুকনো পাতা ও গাছের ডাল পড়ে রয়েছে। এই গ্রীষ্মেও বাড়িটি বেশ ঠান্ডা। কারণ বাড়ির পিছনেই একটি বিশাল তেঁতুল গাছ ডালপালা বিছিয়ে সমস্ত বাড়িটিকে নিবিড় ছায়ায় ঢেকে রেখেছে। যেন বাইরের সমস্ত কুদৃষ্টি থেকে সযত্নে বাড়িটিকে আড়াল করে রেখেছে। অভিজ্ঞান মুখ তুলে ওপরে তাকাল। সূর্যের আলো পাতার ঘন আবরণ ভেদ করে বর্শার ফলার মত চোখে এসে বিঁধছে। একদৃষ্টে বেশিক্ষণ তাকান যায়না। গাছের ওপর থেকে একটি বিরহ কাতর কোকিল ক্রমাগত তারস্বরে প্রিয়তমাকে গাল দিয়ে চলেছে। অভিজ্ঞান খানিক্ষণ চোখ কুঁচকে পাখিটিকে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘন পাতার আবরণ ভেদ করে তার দৃষ্টি বেশিদূর গেল না। এই চেষ্টার ফলে অভিজ্ঞানের চোখে জল চলে এল। মুখ নামিয়ে উড়ুনি দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সে স্বগতোক্তি করল "এমন লুকিয়েছিস বেটা তোর বউও তোকে খুঁজে পাবে না।" কথাটি মুখ থেকে বেরোনোর সাথে সাথে বিদ্যুৎ চমকের মত তার মনে হল তাই তো, লুকোনোর এর চাইতে ভাল জায়গা আর কি হতে পারে ! মহাভারতে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় তাদের অস্ত্র তো গাছের ওপরেই লুকিয়ে রেখেছিল। ঝোপ-ঝাড় ঠেলে অভিজ্ঞান গাছের গোড়ার কাছে পৌঁছল। এত বিরাট

তেঁতুল গাছ সচরাচর চোখে পড়ে না। মাটি থেকে ছ-সাত হাত অবধি কোন ডাল নেই। মই ছাড়া গাছে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু ধারে কাছে কোন মই নেই। অভিজ্ঞান দেখল গাছটির একটি ডাল নিচু হয়ে শুঁড়ি খানার ঠিক ওপর দিয়ে গেছে। ডালটি এত মোটা যে একজন লোক অনায়াসে তাতে বসে থাকতে পারে। ঘরের দেওয়ালে অর্গলহীন জানলা। যদি কোনরকমে ওই জানলাটার ওপর পা রাখা যায় ...। অভিজ্ঞান ঘরের ভিতর থেকে একটা ভাঙা বাঁশের মাচা বার করে আনল। আগে হয়ত এর ওপর মদিরা, আসব ইত্যাদির পাত্র রাখা থাকত। মাচাটিকে ঘরের দেওয়ালের সাথে কাত করে রাখতে একটা ঢালের সৃষ্টি হল। অভিজ্ঞান কাপড়ে মালকোচা মেরে সেই ঢাল ধরে উঠে প্রথমে জানলা আর তারপর ছাদে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। বার কয়েক ব্যর্থ হয়েও সে হাল ছাড়ল না। অবশেষে অতি কষ্টে সে ঘরের চালে উঠতে পারল। তেঁতুল গাছের মোটা ডালটি ধরে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হল। গাছের কাণ্ডের কাছে পৌঁছে দেখল আর সমস্যা নেই। অনায়াসে সে ওপরের ডালটিতে চড়ে বসল। জায়গাটি পাতার আচ্ছাদনে প্রায় অন্ধকার। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে ওপরের দিকে তাকাতে সে দেখতে পেল হাত কয়েক উপরে আরেকটি মোটা ডাল বেরিয়েছে। তার গোড়ার দিকে একটি সবুজ কাপড়ের পুঁটলি বাঁধা। কাপড়ের রঙ পাতার সঙ্গে এমনভাবে মিশে রয়েছে যে দূর থেকে কিছুতেই চোখে পড়বে না। অভিজ্ঞানের মনে হল আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে। অতি কষ্টে উল্লাস দমন করে সে ধীরে ধীরে ডালটির দিকে অগ্রসর হল।

বলরাম আর বীরভদ্র অভিজ্ঞানের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে নদীর ঘাট অবধি চলে এসেছেন। দন্ডপানির সঙ্গে পরামর্শ করার পর বীরভদ্র একমুহূর্ত দেরি না করে অভিজ্ঞানের শ্বশুর বাড়িতে ছুটে এসেছেন। বেলা পড়ে এসেছে। এখনও অভিজ্ঞানের দেখা নেই। চিন্তিত বলরাম ও বীরভদ্র তাই তাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। রাস্তায় দু পক্ষের মুখোমুখি দেখা। অবাক অভিজ্ঞান বীরভদ্রকে দেখে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল কিন্তু বীরভদ্র তাকে ইশারায় থামিয়ে দিলেন। বলরাম চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন "কোথায় ছিলে ! এই দুপুর বেলায় রোদের মধ্যে কোথায় ঘুরছিলে ? তোমার হাত পা'র একি অবস্থা ! এত জায়গায় ছড়ে গেল কি করে ?" অভিজ্ঞানের অভিযান সফল হলেও সম্পূর্ণ কণ্টক মুক্ত ছিলনা। গাছে ওঠার সময় হাত-পা ছড়েছে, তার ওপর নামার সময় বাড়ির জীর্ণ চাল তার ওজন রাখতে পারেনি। সে চাল ভেঙে নীচে পড়েছে। গুরুতর ছোট না লাগলেও হাঁটু আর কোমরে সে ভালোই ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু বলরাম লকে উদ্বিগ্ন করা চলবে না। তাই সে বেশ হাসি হাসি মুখে বলল "ও কিছু না, দেখছিলাম ফলসা কি কামরাঙ্গা কিছু পাই না কি।" বলরাম বিরক্তি গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে বললেন "তা সে বললেই পারতে, আনিয়ে রাখতাম। দুপুর রোদে জঙ্গলে যাবার কি দরকার ছিল ! এখন চল, বাড়িতে সবাই চিন্তা করছে।" বীরভদ্র একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল "আপনি যান, আমরা পিছন পিছন আসছি, ও একটু হাত মুখ ধুয়ে নিক।" বলরাম আর কথা বাড়ালেন না। বিরক্ত মুখে বাড়ির দিকে হাঁটা লাগালেন। বলরাম খানিকদূর গেলে বীরভদ্র বললেন "এবার আসল কথাটি বলো। তুমি শুঁড়ি বাড়ির দিকে গিয়েছিলে, তাই তো ?" অভিজ্ঞান আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বীরভদ্রের চোখের সামনে পুঁটলিটি তুলে ধরল। এতক্ষণ সে সেটা সযত্নে উড়নির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর সে তার আজকের অভিযানের কথা বীরভদ্র কে সবিস্তারে জানাল। উচ্ছসিত বীরভদ্র অভিজ্ঞান কে আলিঙ্গন করে তার পিঠ চাপড়ে দিল। তারপর পুঁটলিটি নিজের হাতে নিয়ে বলল "এটার ব্যবস্থা যথা সময়ে হবে। এদিকে নতুন কিছু খবর এসেছে।" তারা দুজনে ঘাটের ধাপে বসলেন। বীরভদ্র পিপুলবন থেকে প্রাপ্ত সংবাদ সংক্ষেপে অভিজ্ঞানকে জানালেন। "মেয়েটির নাম সতী আর তার স্বামীর নাম মদন। দন্ডপানির মতে একই বিষে বিভিন্ন ফল পাওয়া সম্ভব। দন্ডপানি পিপুলবনে খবর পাঠিয়েছেন। মেয়েটি সন্ধে নাগাদ এসে পৌঁছবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে মদনকে সনাক্ত করতে হবে, দুয়ে দুয়ে চার।" অভিজ্ঞান উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। "না, চার নয়। মদন তার বউকে মারার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কেন ? এদ্দিন পরে হঠাৎ কি এমন ঘটনা ঘটল যে মদনের মত একজন আপাতনিরীহ লোক নির্বিচারে নরহত্যা আরম্ভ করল। বিপ্রদাস, তাকে মারার কি কারণ থাকতে পারে ? আর বিষ ? এই সাংঘাতিক বিষ সে পেল কথা থেকে ? নাহ, হচ্ছেনা। আরও তলিয়ে ভাবতে হবে। আপনি মদনের বাড়িতে লোক পাঠিয়েছেন ? সে হয়ত এতক্ষণে পালিয়েছে !" বীরভদ্র মাথা নেড়ে বললেন "পালাতে পারবে না। আমার লোক মদনের বাড়ি গিয়েছিল। মদন সেখানে নেই। কমলদাসের বাড়ি খোঁজ নিয়ে জানলাম মদন নিয়মমাফিক কাজে এসেছে। তাকে তখনই ধরতে পারতাম। কিন্তু ...."

অভিজ্ঞান অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল "কিন্ত কি ?"

বীরভদ্র বললেন "আমার লোক ফিরে এসে খবর দিয়েছে যে মদনের স্ত্রী বাড়িতে রয়েছে। একজন মহিলা ঘরের বাইরে বেরিয়েছিল, আদাড় থেকে কলমী তুলে আবার ঘরে ঢুকে গেছে। একটু খুঁড়িয়ে হাটে। মুখ ঘোমটায় ঢাকা ছিল, তাই দেখতে পায়নি। আমার ধারণা মদন এক নতুন স্ত্রী লোক জুটিয়েছে। তারই পরামর্শে এই কুকাজ সে করেছে।" অভিজ্ঞান মাথা নেড়ে বলল "সেই মহিলার সাথে বা মদনের সাথে বিপ্রদাসের কোন শত্রুতা ছিল না। শত্রুতা না থাকলে সে আমাদের আসবে বিষ মেশাবে কেন ?" বীরভদ্র খানিক চুপ করে থেকে বললেন "সব জানা যাবে, সতী যদি মদনকে সনাক্ত করে, দু-একবার বাঁশডলা দেব, সুড়সুড় করে সব কথা বেরিয়ে পড়বে। তোমার আসবে বিষ মেশান ! ওকে ছেড়ে দেব ভেবেছ !" অভিজ্ঞান চুপ করে ছিল। এবার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার দু চোখ জ্বলছে। সে বীরভদ্রের হাত ধরে বলল "ঠিক বলেছেন। আমার আসব। উফফ, এই সোজা কথাটা বুঝতে এতক্ষণ সময় লাগল। বিপ্রদাস নয়, আমি, আমি ! আমাকেই হত্যার পরিকল্পনা ছিল। বিপ্রদাস তার পরিকল্পনা কানাইকে বলেছিল। কানাই মদনকে। মদন বিষ পেয়েছে ওই মহিলার কাছ থেকে। ওরা জানত বিপ্রর আমন্ত্রণ আমি ফেলতে পারব না। কানাই হয়ত কিছু আঁচ করেছিল। তাই তাকেও হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আমার ওপর কার এত রাগ থাকতে পারে ? তাও মহিলা ! আমি তো জ্ঞানত কখনো ...." অভিজ্ঞানের কথা শেষ হোলো না। দূর থেকে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে ডাক ভেসে এল : "শুনতাসেন ! বাড়ি আহেন, হগগলে আপনের জাইন্ন্য চিন্তা করে। দাদারে লইয়া আহেন। মা আপনাগো জৈন্য আম কাটতাসেন।" ডাক শুনে অভ্যাস বসত অভিজ্ঞান "আইতাসি" বলে উত্তর দিয়ে হঠাৎ হাঁ করে মালতীর দিকে চেয়ে রইল। নদীর এই ঘাটটিতেই তাদের পুনর্মিলন হয়েছিল। তখন মালতীর সঙ্গে ছিল সনকা। বীরভদ্র আর থাকতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন "চল, আম খাবে চল, শ্রীরাধিকে যখন ডেকেছেন তখন ...." অভিজ্ঞান বীরভদ্রের দিকে ফিরে বিস্ময়ের সুরে বলল "বুঝলেন না !" বীরভদ্র ততধিক বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে বললেন "কি বুঝব ! আম খেতে ডাকছেন তোমার শাশুড়ি, এতে আর বোঝবার কি আছে ! সাধে কি বাঙালদের ...." অভিজ্ঞান তীব্র স্বরে বলে উঠল "সনকা, সনকা, সনকাই সে মহিলা। সে জানে আমার জন্যেই ভূরিপাল ধরা পড়েছিল। তার চোখে আমি যে তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহা দেখেছি তা আপনি ভাবতেও পারবেন না। সে মনে করে তার দুর্ভাগ্যের জন্য একমাত্র আমি দায়ী। মনে আছে, আপনারা সনকা কে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে চলে এসেছিলেন। সে মরেনি। নগরে তার প্রবেশাধিকার নেই। তাই তাকে নগরের বাইরেই দিন কাটাতে হয়েছে। নিশ্চই সেই সময়েই তার সাথে প্রাচ্যের বণিকদের যোগাযোগ হয়। সেখান থেকেই কোনভাবে সে বিষ জোগাড় করে। তারপর শুধু সুযোগের অপেক্ষা। মদনের সাথে তার যোগাযোগ কি করে হল সেটা এখন বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মদন যে তার ছলা-কলায় বশীভূত হয় সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। উফফ, কি সাংঘাতিক ! খামোকা আমার জন্য বিপ্রটা মারা গেল !" বীরভদ্র এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, এবার বললেন "সময় নেই, নগরে চল। আগে সতীকে নিয়ে কমলদাসের বাড়ি যাই। যদি সতী মদনকে সনাক্ত করে, তবে সনকা কে ধরতে সময় লাগবে না। কোথায় পালাবে ওই মুখ নিয়ে !"

যাই বললেই যাওয়া যায়না। বিশেষ করে যখন শাশুড়ি মহোদয়া জামাই আদর করবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন। সন্ধ্যের খানিক আগে নিষ্কৃতি পেয়ে তারা যখন দন্ডপানির বাড়ি পৌঁছলেন তখন তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালান হয়ে গেছে। সতী তখনও পৌঁছয় নি। দ্রুত নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তারা ঠিক করলেন বীরভদ্র আগে কমলদাসের বাড়ি যাবেন। সেখানে তিনি মদনকে কোন অছিলায় আটকে রাখবেন। সতী পৌঁছলে অভিজ্ঞান আর দন্ডপানি তাকে নিয়ে কমলদাসের বাড়ি যাবে। সতীকে এখনই কিছু বলা হবে না। দুজন পেয়াদাকে সঙ্গে নিয়ে বীরভদ্র রওয়ানা হলেন। পেয়াদারা প্রথমে ঘরে ঢুকবেনা। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

সতীর পৌঁছতে রাত হল। সে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে বাড়ি পৌঁছবার জন্য। দন্ডপানি তাকে নিয়ে গরুর গাড়িতে করে তৎক্ষণাৎ কমলদাসের বাড়ি রওয়ানা দিলেন। অভিজ্ঞান পিছনে হেঁটে আসতে লাগল। কিছুদূর যাবার পরেই তাদের সাথে বীরভদ্রের দেখা। হতাশ বীরভদ্র জানালেন তিনি পৌঁছবার আগেই মদন ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। রাত হয়েছে। খেয়া

ঘাট বন্ধ। ঠিক হোল কাল সকালে সতীকে নিয়ে কমলদাসের বাড়ি যাওয়া হবে। আজ রাতে সতী দন্ডপানির বাড়িতে থাকবে। চিন্তিত অভিজ্ঞান গরুর গাড়ির পাশে হাঁটছিল। সনকা ও মদন উভয়েই অত্যন্ত ধূর্ত। কমলদাসের বাড়িতে তাদের নিভৃত আলোচনা সে নিশ্চয়ই আড়ি পেতে শুনেছে। কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করলে দেরী না হয়ে যায়। এমন সময় গাড়ি পরপর দুবার খন্দে পরাতে দন্ডপানি গড়োয়ানকে কষে এক ধমক দিলেন। গাড়োয়ান নিচু স্বরে বলল "অমাবস্যার রাত্তির, এক হাত দূরে একে অন্যের মুখ দেখতে পাচ্ছিনা, তো গর্ত কোথেকে দেখব !" কথাটি অভিজ্ঞানের কানে পৌঁছবামাত্র তার মনের দ্বন্দ্ব কেটে গেল। সত্যি তো ! যার মুখ লুকোনোর দরকার সেতো এরকম রাত্রিই খুঁজবে ! বীরভদ্র অভিজ্ঞানের পাশেই হাঁটছিলেন। অভিজ্ঞান তাকে হাত ধরে থামাল। তারপর মৃদু স্বরে বলল "সনকা লুকোন ধন ছাড়া পালাবে না। আজ অমাবস্যা। আজই ওদের সবচাইতে বড় সুযোগ। আলো থাকলে সনকা কিছুতেই বাইরে বেরোবে না। মদন লোভী মানুষ। এই সুযোগ সেও ছাড়বেনা। কালকের জন্য অপেক্ষা করলে দেরী হয়ে যেতে পারে। আমাদের ফাঁদ পাততে হবে।" বীরভদ্র চুপ করে শুনলেন। তারপর চেঁচিয়ে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাতে বললেন।

(নয়)

মদন আন্দাজে নৌকাটিকে তীরে ভেড়ালো। সে বুঝতে পেরেছিল স্রোতের টানে তারা নদীর ঘাট ছাড়িয়ে গেছে। সে লাফ দিয়ে জলে নামল। তারপর ধীরে ধীরে নৌকাটিকে টেনে নিয়ে চলল। কোথাও বা এক বুক জল কোথাও বা হাঁটু অবধি। পা কাদায় বসে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। কয়েক দন্ড কঠিন পরিশ্রমের পর সনকা মৃদুস্বরে বলল "ঘাট দেখা যাচ্ছে।" নক্ষত্রের মৃদু আলোয় মদন দেখল একটি ছোট ঘাট, জনমানবহীন। নৌকা বেঁধে সে সনকাকে পাঁজাকোলা করে ঘাটের সিঁড়িতে নামাল। কঠিন পরিশ্রমে তার হাঁফ ধরে গেছে। সে পইঠায় বসে পড়ল। সনকা আর একমুহূর্ত অপেক্ষা করতে নারাজ। সে মদনের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। আলো জ্বালানো যাবেনা। কারুর চোখে পড়তে পারে। এই অঞ্চলের নাড়ি নক্ষত্র সনকার চেনা। তাই অন্ধকারেও তার বাড়ি খুঁজে নিতে অসুবিধা হলো না। বাড়িতে পৌঁছে সনকা দেখিয়ে দিল কি ভাবে বাড়ির চালে উঠতে হবে। মদন আর দেরি করল না। দ্রুত জানলা বেয়ে সে বাড়ির চালে উঠে বসল। সামনেই তেঁতুল গাছের ডালটির অবয়ব দেখা যাচ্ছে। মদন নির্দ্বিধায় সামনে পা ফেলল। চালের সামনের অংশটি যে সম্পূর্ণ ভাঙা অন্ধকারে সে বুঝতে পারেনি। মড় মড় শব্দে চালের বাকি অংশ টুকু ভেঙে নিয়ে সে মাটিতে আছড়ে পড়ল। তারপরের ঘটনাগুলো মদন ভালো ভাবে ঠাহর করার আগেই ঘটে যেতে লাগল। তার পড়ে যাবার শব্দ পেতেই সনকা মৃদুস্বরে আর্তনাদ করে উঠেছিল। তারপর সামনে, পিছনে, পাশে পরপর কতকগুলি মশাল জ্বলে উঠলো। কে যেন কর্কশ স্বরে হুকুম দিল নড়া চড়া না করার। মদন কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল জনা দশেক লোক তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সে চিৎকার করে উঠলো "আমি কিছু জানি না, ওই সনকা, আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।" তারপর তার চোখ পড়ল একটু দূরে খুব পরিচিত কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। মশালের আলোয় সতীর মুখ, তার সজল চোখ সে স্পষ্ট দেখতে পেল। আর্তনাদ করে মদন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। সনকা বিস্ফারিত চোখে অভিজ্ঞানের দিকে চেয়ে ছিল। তার বিকৃত মুখ রাগে আরও কদাকার আকৃতি ধারণ করেছে। "তুই বেঁচে আছিস ! তোকে ....."

বীরভদ্রের ইঙ্গিতে ততক্ষণে বাকিরা তাকে ঘিরে ধরেছে।

(দশ)

মালতী কাল থেকেই বলছে তার শরীর খারাপ। আজ সকালবেলা বেশ বাড়াবাড়ি হয়েছে। এই নিয়ে পরপর তিন বার সে বমি করেছে। উদ্বিগ্ন অভিজ্ঞান পালকি ডাকতে ছুটল, আর প্রহ্লাদকে পাঠাল বীরভদ্রকে খবর দেবার জন্য। পালকি করে মালতীকে নিয়ে সে যখন দন্ডপানির বাড়ি পৌঁছল, তখন বীরভদ্র সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। দন্ডপানির কাছে মালতীকে পৌঁছে দিয়ে তারা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে দন্ডপানি তাদের ভিতরে ডাকলেন। মালতী জড়সড় হয়ে কোনে বসে রয়েছে। অভিজ্ঞানের যেন মনে হল চকিতে তার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে মালতী আবার ঘোমটায় মুখ ঢাকল।

দন্ডপানি সস্নেহে অভিজ্ঞানের কাঁধে হাত রেখে বললেন "সুখবর হে, বাড়িতে নতুন অতিথি আসছে।" অভিজ্ঞান আমতা আমতা করে বলল "অতিথি ! মানে ... আমি ..."। বিরক্ত বীরভদ্র পিছন থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন "এখনও বোঝেনি ? সাধে কি বলে বাঙালদের ...."

সমাপ্ত

রজত ভট্টাচার্য, নিভৃত সাহিত্যচর্চা আর দূর্গম পাহাড়ে ভ্রমণ তাঁর ভালোলাগা। গদ্য ও পদ্যে সমান দক্ষ। পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী। তাঁর গদ্যের অভিনব শৈলী বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

পারিজাত ব্যানার্জী

চার দেওয়ালের বেড়া

পর্ব ৪

মা, একটা কথা বলবে সত্যি করে, ঠিক কবে থেকে আর কেনই বা সৃষ্টি হয়েছিল একদিন এই দেওয়াল ? বেশ তো ছিলাম আমরা বুনো গন্ধমাখা ভবঘুরের দল ! একসাথে থাকতাম, ভাগাভাগি করে নিতাম সবকিছু একে অপরের সাথে ! খিদে পেলে ফল পেড়ে বা শিকার করে খেতাম। বন্য ফুলের মালা জরিয়ে নিজের নিজের মতো সোহাগ করতাম ! জানোতো, মনে হয় মহাভারতের সময় থেকেই প্রচলিত হয়েছিল এই ইঁটের উপর ইঁট গেঁথে চার দেওয়াল তুলে নেওয়ার প্রথা। কারণ তখন খাবার নয়, মায়ের অপরিণামদর্শী আদেশে যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল এক নারীর সম্ভ্রম এবং মর্যাদাও !

তারপরের প্রজন্ম হয়তো দেখে থাকবে, বাহ, বেশ মজা তো ! চারটে দেওয়াল তুলে নিলেই বেশ রক্ষা করা যায় তো সমস্ত অপকর্ম ও গোপনীয়তা ! কি হচ্ছে তার অন্দরে, কেউ তার খোঁজখবর রাখবে না ! এ তো ভারী ভালো ব্যবস্থা ! তাই আবার গাঁথো ইঁট ! গাঁথতেই থাকো, ততক্ষণ, যতক্ষণ না এক একটুকরো নিজস্ব নির্জনতা বন্দী হয়ে পড়ে গোটা সমাজ !

সেই যে এক একটা পুরোনো বানানো দেওয়াল মাঝেমাঝেই আবিষ্কার করে না প্রত্নতত্ত্ববিদেরা, তার পিছনে কত কি ইতিহাস যে লিখে গেছে রাজা উজির থেকে আমজনতা, তার খবর আর কেই বা রাখে ! কোথাও হয়তো কোনো রাজার লাম্পট্য আজও ফিরে ফিরে মরে, পড়ে উপস্ত্রীদের দীর্ঘনিশ্বাস। রমণীরা বন্দি হন অন্দরমহলে, বিচ্ছিন্ন হয়ে রোধ করা হয় তাদের বিকাশ! আবার কোথাও হয়তো রচিত হয়েছিল কোনো গোপন ষড়যন্ত্র, রক্তের টাটকা দাগ এসে লেপটে গিয়েছিল দেওয়ালে – তার প্রভাবে আজও সেখানে হেঁটে চলে বেড়ায় দমচাপা ভারী বাতাস !

ভালো কিছুও হতো হয়তো – যেমন প্রণয়ীদের একান্ত নিবিড় মিলন, তবে আমি নিশ্চিত, সেই প্রাণ চপলতার রেশ ঠিক ভেঙে দিত ওই সমস্ত প্রহসনমূলক চৌখুপীর বেড়া ! প্রেম যে চিরন্তন, অমলিন – তাই না মা ? তোমার কাছেই তো অমন কত গল্প শোনা! কিন্তু, লক্ষ্য করে দেখেছো তো, চার দেওয়ালের বৈশিষ্ট্যই হল তার ঝড়জল আর কান্নায় ভেজা নোনা ছাল ! ওদের দমবন্ধ করা উপস্থিতি কখনই সৃষ্টি করতে পারে না তাই সুখের অনাবিল উল্লাস !

অত ইতিহাস ঘাঁটার প্রয়োজন নেই। নিজের একান্ত ব্যক্তিগত পরিবেশের মধ্যেই উপলব্ধি করেছি সেই আঁধার ! তোমাকেই তো দেখেছি কতবার, দিনের শেষে নিজের ঘুপচি কোণায় ঢুকে কেমন নির্ভেজাল কান্নায় ভেঙে যেত তোমার দোমড়ানো মোচড়ানো অবয়ব ! সে কান্নার কোনো শব্দ ছিলনা – শুধু ছিল উচ্ছ্বাস। থেকে থেকে তাতেই কেঁপে উঠত তোমার সর্বাঙ্গ ! আর তার শিহরণে আমিও ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে উঠতাম !

অথচ ভাবো, আমাদের যদি একটা বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ থাকত, যার শেষ হত গিয়ে দিগন্তরেখায়, তবে দুঃখ হলেই কেমন সেখানে ছুটে যেতে পারতে বলোতো তুমি ! খোলা আকাশ তখন গোগ্রাসে পান করত সব যাতনা ! অনেক আগেই মুক্তি পেতে তুমি, মিথ্যে লোক ভোলানো গণ্ডি পেরোনোর প্রয়োজনও আর কখনও পড়ত না !

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

একাকী গুলজার

পল-ভর-কা পহেলুঁ তার লেখায় আসে নেমে,
কথায় সুরে জাল বুনে যায় এয়-সি-জিন্দেগীমে,

শব্দ কখন সমুদ্র হয় কলম শুধু জানে,
রোদের মত ছড়িয়ে পড়ে জমিন-সে-আসমানে,

"ইনসানিয়ৎ ওয়াদা দেয়, বেওয়াফা হয় কাজে",
হকিকত-কি-লহর তোলেন আলফাজে আলফাজে,

উম্রভর-কি-না ইনসাফি, খুঁজেছি আস্তানা,
তার জুবানে জীবন আবার বেগানা-মস্তানা,
ইশক-মে-ফানা আজও, ফির দিওয়ানা হয় লোকে,
বুকের কোনায় জমায় যে তার শায়রি, লব্জোকে,

কসম ? সে তো তোলা থাকে খোদা কি দরবারে।
আমরা কুড়োই দু এক নুড়ি সেই সমুদ্রপাড়ে,

এক সমুন্দর গেহরাইয়া যায়না মাপা আর
কোথাও তখন কলম ধরেন একাকী গুলজার।

সঞ্জয় চক্রবর্তী – অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

পলাশ বর্মন

প্রবাসী পাখির গান

বার বার ফিরে আসি। তালা খুলে, ঘরে
আলো জ্বালি। জল খাই। বিছানা নীরব
আয়নার মতো কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে
বিষম আদরে জ্যান্ত দাহ করে শব।

এশহরে গাঢ় শীত। এখানে বাতাস
তুলনামূলকভাবে কিছুটা একাকী।
যেদিকে তাকাই, যেন উপসাগরের
পথ চেয়ে লোনা জল চোখে মুখে মাখি –

দিন রাত্রি যে যেদিকে যেতে চায়, যায়।
তারপর, যথাবিধি কাজে মন দিই।
আহত শাপের মতো ফণা তুলে থাকে
আমার গরাসে শুধু অচেনা সুগন্ধি !

লাস্ট সাপার আসলে নবান্নের শোক –
গাছে গাছে ঘষা লেগে দাবানল হোক !

স্মৃতি

খাই দাই ঘুরি আর থেকে থেকে মন
ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে উড়ে চলে যায়।

এখানে বাতাসে হাল্কা হিম। এ রাস্তায়,
মিউজিয়ামের কাছে, আসি অকারণ,
বারবার। ছাতিমের গন্ধ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
সান্টা বারবারার স্মৃতি জেগে ওঠে। আর,
তার ধর্মান্ধ পিতার মৃত্যুদণ্ড লিখি –
সমস্ত অক্ষর আজ সন্তান হত্যার
বিরুদ্ধে দাঁড়াক। এসো, এই করতলে
রাখো ঠোঁট। রাখো অশ্রু। দেখো, অলৌকিক
গোল্ডেন গেট ব্রিজের নিচে চেনা গঙ্গা।

এখানে বাতাসে হিম আরও ঘন হলে
ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে উড়ে চলে যায়
চন্দ্রাহত জলসত্র, সন্ধ্যা সমবায়।

মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

''জীবইন্যা, উর্জা সেন ও আমি''

পর্ব ১

কাঁঠাল নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার

— দাদু, জীবইন্যার একটা গল্প বলবে ? অনেকদিন তো বলোনি । যখনই বলি, তখনই তোমার এক কথা, বলছি । আর বলবে কবে ?

আবদারের সুরেই প্রশ্নগুলো ছুড়ে দিল উর্জা সেন অর্থাৎ মোমো, আমার পরম আদরের বড় নাতনি । তার গল্প শুনতে কোন ক্লান্তি নেই, বিশেষ করে গল্পটা যদি হয় জীবইন্যার গল্প । তার আরও আবদার, গল্প বলতে গিয়ে সহজে থামলে চলবে না, চ্যাপ্টারের পর চ্যাপ্টারে গল্প বলে যেতে হবে । নো থামা ।

তোমরা হয়ত এতক্ষণ ভেবেই মরছ, এই জীবইন্যা লোকটা আবার কে ? আর নামের কি বাহার । জীবইন্যা । এরকম একটা বিদঘুটে নাম তো আগে কখনও বাপের জন্মে শুনিনি । আর কী এমন তার গল্প ?

ভূমিকা ছেড়ে এবার আসল কথায় আসা যাক । জীবইন্যা আমার ছোটবেলার বন্ধু — সেই নেংটো বয়স থেকে । আমরা একই গ্রামে থাকতাম, একই স্কুলে যেতাম এবং একই ক্লাসে পড়তাম । একটা মজার ব্যাপার, আমাদের দু'জনের নামের সাদৃশ্য — আমার নামও জীবন, ওর নামও জীবন । ওর বাবা-মা পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে জীবন না বলে 'জীবইন্যা' বলে ওকে ডাকতেন । (ভাগ্যিস, আমার মা বাবা সে ভুলটা করেননি ।) এই হল ওর নামের ইতিহাস । সারা গ্রাম জুড়ে সে জীবইন্যা বলেই বিখ্যাত । কে না চেনে জীবইন্যাকে ? আর না চেনবার তো কোন কারণ নেই । ওর দজ্জালপনায় একদিকে যেমন সবাই তটস্থ থাকত, তেমনি নিত্যনূতন বুদ্ধির খেলা, নানা রকম ভেলকি দেখানো এবং পূজাপার্বনে ওর ভক্তি গদগদভাবের জুরি মেলা ভার ।

জীবইন্যার বাবা হরিপদ দত্ত ছিলেন গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, পেশায় ব্যবসায়ী — কাছেই পদ্মা নদীর পাড় লাগোয়া লৌহজং বন্দরে ছিল তাঁর মস্তবড় কাপড়ের দোকান । আমরা হরিপদ কাকুর বসত ভিটার দক্ষিণ অংশের একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতাম । আমার বাবা গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন । বাবা ছিলেন জীবইন্যার গৃহশিক্ষক । এ সব কারণে জীবইন্যার সঙ্গে ও ওদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের এক নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে ।

পাড়াপড়শী বলত আমরা দু'জন অভিন্নহৃদয় । একদিকে কথাটা ঠিক । আশে পাশের অন্যান্য গ্রামের স্কুলবন্ধুদের চেয়ে জীবইন্যার সঙ্গেই কাটতো আমার বেশী সময় — বাড়িতে, স্কুলে, খেলার মাঠে, পুকুরে সাঁতার কাটার সময় । নৌকায় পদ্মাপাড়ি দেওয়া, পূজা-পার্বনে ও অন্যান্য গ্রাম্য অনুষ্ঠানে । মোট কথা, ওকে এড়াবো এমন সাধ্য আমার ছিল না । স্বভাবটা ছিল অদ্ভুত — একদিকে প্রচন্ড মারকুটে, খামখেয়ালি, অন্যদিকে গরীব-দুঃখীদের প্রতি দয়ালু । তবে জীবইন্যার মাথায় সব সময় দুষ্টুবুদ্ধি গিজগিজ করতো । এমনিতে কাঠির মত চেহারা, কিন্তু নিজে খেতে এবং মানুষজনকে খাওয়াতে খুব ভালোবাসতো ।

ওর চালচলন ছিল বেশ রহস্যময় । হঠাৎ, হঠাৎ কোথায় যে উধাও হয়ে যেত মাঝে মধ্যে কেউ তার হদিশ পেত না । আবার ধূমকেতুর মতো হঠাৎ আবির্ভাব । আমাকে ভালো ও বাসতো, মাঝে মধ্যেই আমাকে পেয়ারা, নারকেল কুল, বাতাসা, মুড়ির মোয়া খেতে দিত । আবার অন্যসময় সে অন্যমূর্তি ধরত । সুযোগ পেলেই নানারকম ফস্টিনস্টি করা, আমাকে কিলঘুসি মারা, আমার বইপত্তর ওলটপালট করা বা লুকিয়ে রাখা এবং খেলার মাঠে ফুটবলে লাথি না মেরে আমার পায়ে

গোড়ালিতে বেদম লাথি মারা — এ ছিল তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহার। আমি কতবার বলেছি, ওর পা ধরে কাকুতিমিনতি করেছি — জীবইন্যা, দোহাই তোর, আমাকে তোর টিমে খেলতে নে। আমি তোর সঙ্গে খেলব। ওর ওই এক উত্তর — ভাগ, তুই রতনের দলেই খেলবি। বেশি প্যানপ্যান করবি না। বলেই আরেক লাথি মারত আমায়।

উর্জা সেনের এ সব 'চ্যাপটার' অনেকবার বলা হয়ে গেছে। নতুন কিছু বলতে হবে। কি বলব ভাবছি এমন সময় অধৈর্য হয়ে উর্জা গর্জে উঠলো —

— কি হলো দাদু, বলো ? আর কতক্ষণ লাগবে ভাবতে ?

— হ্যাঁ মনে পড়েছে। জীবইন্যার এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দুষ্টুবুদ্ধির দস্যিপনার কথা। সে সময়টা ছিল বর্ষাকাল। গ্রামকে গ্রাম জলে জলাকার। কোথাও যাতায়াত করতে হলে, নৌকা ছাড়া উপায় নাই। আমরা গ্রামের ছেলেমেয়েরা ঐ বয়সেই নৌকা বাইতে পারতাম। স্কুলে যেতাম দলবেঁধে নৌকা বেয়ে, বাজারহাট করতে যেতাম নৌকায়, এমনকি বিয়ে বাড়িতে যেতাম নৌকায়। বেড়াতে যেতে হলেও সেই নৌকাই ভরসা। অর্থাৎ যে কোনও যাতায়াতে নৌকাই ছিল আমাদের প্রধান বাহন।

একদিন স্কুল শেষে সবে বাড়ি ফিরেছি, মূর্তিমান জীবইন্যা এসে হাজির আর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি —

— চল, এক্ষুনিই চল। বন্দরে যেতে হবে। মানে বাজারে।

— কেন ? এই তো সবে স্কুল থেকে এলাম। এখনই আবার বের হতে হবে কেন ? মা বকবে।

— বাজে বকবক করিস না। যা বলছি তাই কর। তাছাড়া, কাকিমা খুব ভালো মানুষ; কাকিমা কখন ও বকেন না। কাকিমাকে যা বলার আমি বুঝিয়ে বলব।

এই বলে এক ঝটকায় আমার হাতটা টেনে নিয়ে আমায় ঠেলে নৌকায় তুলল। তারপর সোজা লৌহজং বন্দর। ছোটবড় শত শত নৌকা সেখানে নোঙর করে রয়েছে। ঐ দিনটা ছিল আবার হাটবার। সারা বন্দরের হাট জুড়ে গিজ গিজ করছে অগুনতি মানুষ, অগুনতি নৌকা। জীবনন্যা কোনমতে একটা জায়গা খালি পেয়ে নৌকাটা সোজা সেখানে ঢুকিয়ে দিল এবং একটা খুঁটিতে বেঁধে ফেলল। তারপর আমরা বন্দর ছাড়িয়ে এগোতে থাকলাম। ভিড় ঠেলে চলেছি তো চলেছি। কোন দিকে যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। জীবন ইন্যাকে কিছু জিজ্ঞেস করব সে সাহস ও আমার নেই। একটার পর একটা দোকান পার হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু জীবইন্যার যেন কোন হুশ নেই। কি ওর মতলব, কি ওর উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ একটা বিশাল ফলের দোকানের সামনে জীবইন্যা দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনেই একটা লোক কাঁঠাল বিক্রি করতে বসেছে। বিশাল বড় বড় কাঁঠাল, কত যে এক একটার ওজন হবে ধারণা করাই কঠিন। সবচেয়ে ছোট কাঁঠালটার ওজন কম করে আট দশ সের হবে।

জীবইন্যা দোকানদারকে আঙুল দিয়ে একটা কাঁঠাল দেখাল, কম করেও সেটা দশ বারো সের ওজনের হবে। জিজ্ঞেস করল — কত দাম ? দোকানদার বলল: ঠিক দাম বলব, না দরাদরির দাম ? তারপর জীবইন্যার দিকে তাকিয়ে কি যেন কি মনে হল; দোকানদার বলল, তিন টাকা। এক পয়সা কমেও সে বেচবে না। আমি ত প্রায় আর্তচিৎকার করে উঠি। জীবইন্যা কিন্তু নির্বিকার। কুছ পরোয়া নেই — ভাবখানা এরকম। আসলে জীবইন্যার কাছে তিন টাকাটা কিছুই না। ওর বাবার অঢেল টাকা। প্রতিদিন হাতখরচ বাবদ জীবইন্যা যে টাকা পায় তা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের তিনদিনের বাজার হয়ে যায়। তক্ষুনিই পকেট থেকে কড়কড়ে তিনটাকা বের করে দিল সে দোকানদারকে।

কাঁঠাল ত কেনা হল। আমার মাথায় বাজ পড়ার মত অবস্থা যখন জীবইন্যা আমায় বলল, তোল, কাঁঠালটা তুলে নৌকায় নিয়ে যা। আমি বলি — জীবইন্যা, পাগল নাকি ? এতবড় কাঁঠালটা একা আমি তুলব কি করে ? আমি পারব না। জীবইন্যার যেন একটু দয়ামায়া হল। তখন কাঁঠালটার একদিক ধরল জীবইন্যা, আরেক দিক ধরলাম আমি। এমনি করে টানতে টানতে কাঁঠালটা'কে এনে তুললাম নৌকাতে।

তখনও জানিনা জীবইন্যার উদ্দেশ্যটা কি । নৌকায় উঠেই সে খুঁটির দড়ি খুলে সোজা নৌকা চালিয়ে নিয়ে চলল কনকসারের খাল পার হয়ে পদ্মার দিকে । তখন সন্ধ্যে হয় হয় । চারিদিকে পাতলা অন্ধকারের আস্তরণ ছড়িয়ে পড়েছে । পদ্মার তুমুল গর্জন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে । খালের মুখ পার হতেই গিয়ে পড়লাম পদ্মার প্রচন্ড ঢেউয়ের মধ্যে । উত্তাল ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকা তোলপাড় । তার সঙ্গে স্রোতের টান । বিপদের আশঙ্কায়, বাড়ির কথা ভেবে, আসন্ন অন্ধকারের কালোছায়ায় আমি অসহায় বোধ করতে লাগলাম ।

— জীবইন্যা, কোথায় যাচ্ছিস ? কেন এরকম পাগলামি করছিস ? সামনের বড় বড় ঢেউগুলি দেখছিস না ? নদীর আর কত ভেতরে যাবি ?

আমি চিৎকার করতেই থাকলাম । কিন্তু কে শোনে কার কথা । নদীর পাড় ছাড়িয়ে নৌকা যখন নদীর ভিতরে বেশ কিছু দূর গিয়ে পড়েছে তখন বিপদের উপর আরেক বিপদ । হঠাৎ নৌকার হাল ছেড়ে দিয়ে নৌকার অন্যপ্রান্ত থেকে চিৎকার করে জীবইন্যা যা বলল তাতে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া ।

— নে, এবার কাঁঠালটা ভেঙ্গে খা । দেখবি, একটা কোয়াও যেন পড়ে না থাকে । — বলিস কি । পাগল নাকি ? এতবড় একটা কাঁঠাল কেউ একা খেতে পারে ? তাছাড়া কাঁঠাল আমার মোটেও ভাল লাগে না । আমি খাব না। খাব না । খাব না ।

— কি, খাবি না ? দেখ তাহলে কি করি আমি । কাঁঠালটা তোকে সব খেতেই হবে, নইলে পদ্মার জলে নৌকা ডুবিয়ে দেব । দেখবি মজা ।

হায় ভগবান ! কি দস্যুর পাল্লায় পড়লাম । অনেক কাকুতি মিনতি করি জীবইন্যার কাছে, বলি — দোহাই জীবইন্যা । তোর পায়ে পড়ি । এতবড় সর্বনাশ করিস না আমার । এবার নৌকা ফেরা । দেখছিস না, কি বিশাল বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে । এক্ষুনি নৌকা উল্টে পড়বে ।

কিন্তু কে শোনে কার কথা । জীবইন্যার একগুয়েমির অন্ত নেই । — এখনও বলছি কাঁঠালটা শেষ কর । নইলে নৌকা মাঝদরিয়ায় নিয়ে যাব । বুঝবি তখন মজাটা ।

নিরুপায় হয়ে এই দস্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম জপ করতে আরম্ভ করলাম । — ভগবান, ভগবান, রক্ষা করো, এই দস্যুর হাত থেকে আমায় উদ্ধার করো । এই দস্যুর মাথায় একটু সুবুদ্ধি দাও ।

ভগবান আমার কথা শুনলেন । ঠিক সেই মুহূর্তেই একট পর্বতপ্রমাণ ঢেউ এসে নৌকাটাকে প্রচন্ড ধাক্কায় উল্টে ফেলে দিল । আর সঙ্গে সঙ্গে কাঁঠালটা ঢেউয়ের টানে জলের তলায় ডুবে গেল । তারপর ঢেউয়ের ক্রমান্বয় ধাক্কায় দূরে কাঁঠালটা ভেসে গেল দেখতে পেলাম । আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম । তবে আমরা দুজনেই সাঁতারে পটু, তাই সাঁতার কেটে নৌকাটাকে ঠেলে ডাঙ্গার দিকে নিয়ে এলাম । জীবইন্যার নিষ্ঠুর রসিকতা —

কেমন একটা অ্যাডভেঞ্চার হল বলতো ?

— এর নাম অ্যাডভেঞ্চার ? এ তো প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আমি উত্তরে বললাম ।

জীবইন্যা হো হো করে হেসে উঠলো ।

* * *   * * *   * * *

Manotosh Banerjee (Sept 1930- June 2014) was born in Dhaka, Bikrampur in undivided India (now Bangladesh). He was professor and head of the department of English at Dinabandhu Andrews College in Kolkata, India where he taught for 40+ years. To generations of students whose lives he touched in many ways, he was their favorite "Sir" whose deep voice reciting Shelley and Keats was one of their most treasured memories. He was an avid reader with wide-ranging interests, and wrote fiercely and passionately on many topics. He was highly revered in the Kolkata community as a thinker and a leader. Some of his legacy, his writings, he left for his beloved family. The current story is a snippet of that legacy he had left for his eldest granddaughter.

মৌসুমী ব্যানার্জী

বাবা

পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে এক ছোট্ট দ্বীপ যার নাম ইনিশমান। সেই দ্বীপের বাসিন্দা সংখ্যা দেড়শো। মানুষ আর অড়স্র ভেড়া, সাদা সাদা ফুটকি হয়ে তারা ছেয়ে থাকে দ্বীপের সবুজ পাহাড়ে। সমুদ্র এখানে নির্মম, রুক্ষ, ভয়ঙ্কর সুন্দর। লম্বা এক ফালি বাদামি কাপড়ের মতো বিছিয়ে থাকা সেই দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে যাওয়ার পথ-টা বন্ধুর, হোঁচট খেতে হয় বারংবার, পায়ে কাঁটা বিঁধে রক্তক্ষরণ হয় তবু চলা থামানো যায় না। এই পথের শেষে জঙ্গলে গাছগাছালির মধ্যে বড়সড় চ্যাপ্টা একটা পাথর যেখান থাকে গভীর খাদ সরাসরি নেমে গেছে উন্মত্ত সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর সমুদ্রের বুকে। পৃথিবীর শেষ প্রান্তটা আমাদের কল্পনায় যেমন নিঃসঙ্গ, একলা, অনন্তপ্রসারী, এই পাথর ঠিক তেমনই – শুধু তার গায়ে ছোট্ট অক্ষরে লেখা ''Synge's Chair''।

এই পাথরটা আমার চেনা, এই উত্তাল জলরাশির ভীষণ আক্রোশে আছাড়ে পড়া, এর ভয়ঙ্কর গর্জন আমার খুব জানা। আর খুব চেনা মরিয়া, সেই মা, যার এক একটা ছেলেকে টেনে নিয়ে গেছে হিংস্র সমুদ্র, জেলে ডিঙি নিয়ে জীবিকা অর্জন করতে বেরিয়ে যারা আর ফেরেনি ঘরে। এদের আমি চিনেছি আমার বাবার মনন, বোধ দিয়ে, আমার বাবার কণ্ঠ আর চোখের ভাষায়। যেন অনেক আলোকবর্ষ পেরিয়ে ভেসে আসছে বাব'র গলা – বাবা পড়াচ্ছেন J.M. Synge এর নাটক Riders to the Sea – সন্তানহারা মরিয়া'র অন্তরের কান্না বিশ্বচরাচর বিদীর্ণ করে খানখান হয়ে ফেটে পড়ছে আমার বাবার গলায়।

বাবা আমার কাছে শুধু জন্মদাতা ছিলেন না, বাবা ছিলেন আমার জানালা। এই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমি কান পেতে শুনেছি বাবা মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করছেন শেলি, কিটস, বাইরন-এর কবিতা, স্মৃতি থেকে বলছেন দান্তে-র ইনফার্নো, আর আমি তখন ক্লাস সিক্স কি সেভেন, দুই বিনুনি, কখনো পাশের ঘরে, কখনো বাবার এম. এ. ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চেপ্টাচেপ্টি হয়ে বসে সমস্ত চেতনায়, সমস্ত মননে প্রবেশ করিয়ে নিচ্ছি সেই অমোঘ বাণী

" Have more than thou showest
Speak less than thou knowest
Lend less than thou owest
Ride more than thou goest
Learn more than thou trowest
Set less than thou throwest."

বিজ্ঞানের নিবিষ্টমন ছাত্রী ছিলাম, কিন্তু আমার অবচেতনেই কোন ফাঁকে যেন অসমোসিস ডিফিউশন হবার মতো কবিতা নাটক ঢুকে গেছে আমার রসে, আমার বোধে। আজ পেশাগত, জীবনের বিজ্ঞানচর্চা আমাকে দেয় ইন্টেলেকচুয়াল স্টিমুলেশন, কিন্তু সাহিত্য সঙ্গীত আমার কাছে ঘরে ফেরা, জ্বরের মাথায় মা'র হাতের জলপট্টি, পরম নির্ভরতা। অজান্তে না বুঝেই এটা সম্ভব করেছেন আমার বাবা, সেই সুরকীখসা দেয়ালের গায়ে টিকটিকি আটকে থাকা মুহূর্ত থেকে যখন একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের হাঁ করা মেয়ে শিখেছিল আচার আচরণের আড়ম্বর আর সামাজিকতা পেরিয়ে উত্তরণের মন্ত্র, তার জীবনের প্রথম পুরুষের কণ্ঠে, জীবনের একমেবাদ্বিতীয়ম পরম পুরুষের বাণীর মধ্যে দিয়ে

''মনেরে আজ কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।

যাহার লাগি চক্ষু বুজে বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর ।
মনেরে তাই কহো যে
ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে ।''

সময় বদলে যায়, দৃশ্য বদলে যায় । তবু এক প্রজন্ম পেরিয়ে আরেক প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে থাকে ছোট ছোট চেতনা, ছোট ছোট ভালোবাসা । দাদু'র গলা জড়িয়ে পাশাপাশি শুয়ে উরজা শোনে দাদুর Don Quixote বন্ধু জীবইনার গল্প, মাঝনদীতে ''হয় গোটা কাঁঠাল খ, নয়তো নৌকা ডুবিয়ে দেবো''-র হুমকি, আর নিছক রিকশা চড়ার আনন্দ মেটাতে বাড়ির সামনে থেকে রিকশায় গন্তব্যহীন শুধু আসা যাওয়া চলে দাদু নাতনির । এরই ফাঁকে খুচখুচিয়ে স্যালাড কাটতে কাটতে চার বছরের নাতনীকে দাদু শেখান ''ওম জবাকুসুম সংকাশং, কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং । . . .'' আর নাতনি সবুজে সবুজ মাখা প্রান্তর পেরিয়ে প্রজাপতির পেছনে ছুটতে ছুটতে বলে ''ধনতারিং সর্বপাপঘ্ন, প্রণতোহস্মি দিবাকরম ।'' উজানের জন্য এদিক ওদিক সেদিকের নানা পেপার কাটিং জড়ো করে স্ক্র্যাপবুক বানান দাদু, তাতে ছোটা ভীম কখনো হাওয়াই জাহাজে চড়ে হুস করে আমেরিকা যাচ্ছে কিংবা কখনো পাখির ডানায় ভর করে কেনিয়া-র জঙ্গলে । তিন চাকা, চার চাকা'র রং বেরঙ গাড়িরা ঘরের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে দুলতে দুলতে চলে দুটো ছোট্ট হাতে ভর করে, আর তার সঙ্গে ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়ে ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত জুড়ে চলে দাদু'র উজানবাবু'কে খাওয়ানো – সাদা ভাত আর সাদা ডিম ।

এইসব নিয়েই আমার বাবা, আমার বাবা'কে জানা । এইসব তুচ্ছ কিন্তু সত্য, এইসব উত্তরণ, এইসব অবগাহন, এইসব মধুর তীব্র, স্থুল সুক্ষ্য সবকিছু মাখামাখি হয়ে বাইলেনের সেই হাঁ করা মেয়ের বড় হয়ে ওঠা, দুই বিনুনি থেকে মধ্যবয়সের অবিন্যস্ততা, অনেক ভূমিকাপালনের শেষে নিজের অন্তস্থলে ঢুকে নিজেকে দেখা --- খানিকটা বাবার মতো হয়ে ওঠে, আবার খানিকটা কারুর মতো না, এক্কেবারে নিজের মতো হওয়া । এই এক্কেবারে নিজের মতো হয়ে ওঠার স্পর্ধাটুকুও পরোক্ষভাবে বাবার কাছ থেকে পাওয়া--- বাবার কিং লিয়ার-এর সত্তায় ''speak what you feel, not what you ought to say'', কিংবা মন্ত্রোচ্চারণের মতো বাবার কণ্ঠে বাইরন-এর কবিতায়

"But I have lived,
And have not lived in vain.
My mind may lose its force, my blood its fire
And my frame perish even in conquering pain,
But there is that within me which shall tire
Torture and time, and breathe when I expire."

এইসবের মধ্যেই আমার বাবাকে মনে রাখা । এই মনে রাখা চলবে আবহমান । বাড়ি বদলে যাবে, পারিবারিক অবস্থান বদলে যাবে, তবু হঠাৎ কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে হয়তো বই' এর তাক থেকে দরকারি কোন বই পাড়তে গিয়ে মুখ থুবড়ে সামনে পড়বে Selected Poems of William Wordsworth – যার প্রথম পাতায় নিটোল অক্ষরে লেখা ''To paka on her 21st birthday with love''।

আর আমি সেই অদরকারি বই-এর পাতা উল্টে পৌঁছে যাবো অনেক বর্ষা পিছনে ফেলে আসা আমার ছোটবেলায়, যেখানে আমার বাবা তোয়ালে বিছিয়ে রাখা বেতের চেয়ার'এ বসে চোখ বুজে উদ্ভাসিত আলো আলো মুখে আবৃত্তি করছেন

"Ten thousand daffodils
Saw I at a glance
Tossing their heads in sprightly dance.

Beside the lake,
Beneath the trees
Fluttering and dancing in the breez…"

আর তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি চোখ বুজে বাবা'র কানে কানে বলবো

" And then my heart
With pleasure fills
And dances with the
daffodils…."

আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সের অধ্যাপক ডঃ **মৌসুমী ব্যানার্জী**, গবেষণার বিষয়বস্তু অঙ্ক দিয়ে অনকোলজি-র সমাধান। জন্ম কলকাতায়, লেখাপড়া কলকাতার পাঠভবন স্কুলে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট এবং পরবর্তীকালে ডক্টরেট উপাধি আমেরিকার উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কর্মসূত্রে বিশ্বনাগরিক। পেশাগতভাবে মৌসুমীর বাস ঘোর বিজ্ঞানের জগতে। বিজ্ঞান ওঁকে দেয় ইন্টেলেকচুয়াল স্টিমুলেশন, কিন্তু সাহিত্য সংগীত মৌসুমীর কাছে ঘরে ফেরা, জ্বরের মাথায় মায়ের হাতের জলপট্টি, পরম নির্ভরতা। লেখালেখির শুরু কলেজ জীবন থেকেই। মৌসুমীর কবিতায় নাগরিক একাকীত্ব এবং জীবনের সঙ্গে জীবন সম্পৃক্ত করে বাঁচা, পাশাপাশি রয়েছে অপলক মুগ্ধতায়। বাড়ি বদলে গেছে, দেশ বদলে গেছে, তবু মৌসমীর কবিতায় আজও সেই সুরকিখসা দেয়ালের গায়ে টিকটিকি আটকে থাকা মুহূর্তের অপাপবিদ্ধ ছবি।

উদ্দালক ভরদ্বাজ

ভিসওয়াভা শিম্বরস্কা

জন্ম ঃ ২ জুলাই, ১৯২৩, প্রয়েন্ট, পজনা-ভইভোদেশি (অধুনা কর্ণিক, পোল্যান্ড)

মৃত্যু ঃ ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, ক্রাকও, পোল্যান্ড

সাহিত্য নোবেল প্রাপ্তি ঃ ১৯৯৬, পোল্যান্ড

নোবেল প্রাপ্তির প্রণোদনা ঃ "ব্যক্তি মানুষের খণ্ড জীবনচিত্রে প্রতিভাত ইতিহাস ও মহাজীবনের ছবি সম্বলিত কবিতার জন্যে” ভাষা: পোলিশ

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ঃ ৩০

প্রথম প্রকাশিত কবিতা ঃ Szukam słowa (Looking for a word, 1945)

প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ Dlatego żyjemy (That's Why We Are All Alive, 1952)

শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ Dwukropek (The Colon, 2006)

জীবিকা ঃ সাংবাদিক, লেখক, সম্পাদক

অনুদিত কবিতাগুলি নিয়ে কিছু কথা ঃ

‘একটি স্মৃতি’ কবিতাটি আদতে নিখাদ একটি গল্প, চার পাঁচটি চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে একটি ছুটির ছবি, সঙ্গে টানটান সম্পর্কগুলির নানা টানাপোড়েন, এবং তার মধ্যে দিয়ে সমাজের একটি নিখুঁত স্থিরচিত্র এঁকে ফেলেন কবি তিন ছত্রের গণ্ডির মধ্যেই। সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে দ্রষ্টার চোখে, “নেশা” কবিতায়, এই আপ্তবাক্যের একটি অসাধারণ সম্প্রসারণ ও ইতিবৃত্তের মাধ্যমে কবি আমাদের বলে দেন, পুরুষ নারীর এই চিরন্তন আকর্ষণের খেলায় কত সহজেই অভিনয় বশ করতে পারে মানুষের মন, অথচ সেই অভিনয় ও সাজানো বিস্ময়টুকু বাদ দিলে মানুষের ক্ষীণ অস্তিত্ব বিপন্ন হয় তার সামান্যতার অনুধাবনে। শব্দের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যে অপ্রকাশ থেকে যায়, তার কাছে কবি ক্ষমাপ্রার্থী Under A Small Star কবিতায় । যেটুকু ধরা যায়, তার বাইরেও যে ব্যাপ্তি আছে তা কবিকে আকৃষ্ট করে । প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রকাশের যন্ত্রণার মধ্যে তিনি তাই বিভক্ত। এই ক্ষুদ্র জীবনের ছোট ছোট ভাবনা, আনন্দ, বিষাদ, ঘটনা, ব্যক্তি, ইতিহাস, উপেক্ষিত জনজীবন, এমন কি নির্জীব টেবিলের পায়াকেও কবি এই মহাজীবনের ক্ষুদ্র অঙ্গ হিসেবেই ধরেছেন । তাঁর আক্ষেপ, এত সব ঘটনাবলী কবি সে ভাবে ছুঁতে পারেননি তার কবিতায়। সেই অক্ষমতার গ্লানির প্রকাশ এই দীর্ঘ কবিতা। “ছোট্ট তারার নিচে” নাম দিয়ে কবি এও বলেছেন এত বিশদ আয়োজন সত্ত্বেও এই সব টুকরো টুকরো বিন্যাস কিন্তু কালের নিরিখে অর্থহীন। তবু যেন কোথাও কিছু আছে। আপাত ক্ষুদ্র এই জীবনাবলির প্রতি ভিসওয়াভার গভীর মমতাই তাঁর কবিতার মূল শক্তি। তাই তার কবিতা আপাত অর্থহীনতার মধ্যেও কোনো এক চিরকালীন সত্যের আলোয় প্রতিভাত হয়, মানুষকে তার সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করতে অনুপ্রাণিত করে, সন্ধান দেয় সেই অনির্বচনীয়ের। The Three Oddest Words বেছে নেবার কারণ এই কবিতার শব্দের পরিমিতি। কত অল্প শব্দে বোধের গভীরে পৌঁছতে পারা যায় তার উদাহরণ এই কবিতা। কিশোর-প্রেমের উচ্ছ্বল, স্বপ্নিল দিগন্তে কোনো মেঘের ছায়া থাকে না। কিন্তু প্রথম প্রেম ভেঙ্গে যাওয়ার যন্ত্রণা মানুষকে শিখিয়ে দেয় এই নশ্বর জীবনে সব কিছুরই একটা সীমা রেখা আছে। তার সহজ ভাবনায় যে

ভালবাসা ছিল অন্তহীন, তা এখন সময়ের চলে যাওয়ার সংকেতে কিশোরকে শেখায়, “সব রাঙ্গা কামনার শিয়রে” দেয়ালের মত জাগে ধুসর মৃত্যুর মুখ । “First Love” কবিতা এক অব্যর্থ চিত্রকল্প-এর মালা গেঁথে এই কথা পৌঁছে দেয় পাঠকের উদাস মনে । এ কবিতাও তাই আপামর-এর, সাধারণের, অসাধারণের, মানুষের ।

সম্ভাবনাগুলি কবিতা স্টাইলের দিক দিয়ে এক অনন্য প্রচেষ্টা। কবি শুধু তার পছন্দের একটি তালিকা বানিয়ে পাঠককে পড়ান, কিন্তু সেই ইতিবাচক তালিকার আড়ালে আসলে পৌঁছে দেন সঠিক বাঁচার মন্ত্র, প্রতিদিনের জীবনের ভড়ং, শঠতা, ছলনাকে এড়িয়ে কি করে সত্য ও সুন্দরের পূজায় কাটানো যায় এই অভূতপূর্ব জীবন, তারই জীবন্ত ম্যানুয়াল জেনো এই কবিতা।

A memory

We were chatting
and suddenly stopped short.

A beautiful girl stepped onto the terrace,
so beautiful,
too beautiful
for us to enjoy our vacation.

Basia shot her husband a panicky look.
Krystyna took Zbyszek`s hand
reflexively.
I thought: I`ll call you,
tell you, don`t come just yet,
they`re predicting rain for days.

Only Agnieszka, a widow,
met the lovely girl with a smile.

একটি স্মৃতি

গল্প করতে করতে হঠাৎ
সবাই চুপ করে গেলাম।

অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে এসে
দাঁড়িয়েছে, বারান্দায়,
কি অদ্ভুত সুন্দর,
এত সুন্দর, যে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল
আমাদের স্বচ্ছন্দ অবকাশ।

শিবানী ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে
ঘন ঘন তাকাতে থাকল স্বামীর দিকে।
কাকলি ঝট করে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলো
সুদীপের হাত দুটো।
আমিও ভাবলাম তোমায় ফোন করি-
“এক্ষুনি এস না, বৃষ্টি হতে
পারে বলছে তো...”

শুধু সদ্য-বিধবা ঋতি, মেয়েটির দিকে
তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে
আলাপ করতে গেল।

Drinking Wine

He looked, bestowing beauty,
and I took it for my own.
Happy, I swallowed a star.

I let him invent me
in the image of the reflection
in his eyes. I dance, I dance
in an abundance of sudden wings.

A table is a table, wine is wine
in a glass that is just a glass
and it stands standing on a table.
but I am a phantasm
a phantasm beyond belief
a phantasm to the core

I tell him what he wants to hear-about ants
dying of love
under a dandelion's constellation.
I swear that sprinkled with wine
a white rose will sing.

I laugh and tilt my head,
Carefully, as if I were testing
An invention. I dance, I dance
in astounded skin, in the embrace
that creates me.

Eve from a rib, Venus from sea-foam,
Minerva from the head of Jove
were much more real.

When he's not looking at me,
I search for my reflection
on the wall. All I see
a nail on which a painting hung.

নেশা

ও তাকাল আমার দিকে,
নিজেকে সুন্দর মনে হল খুব;
বিশ্বাস করে নিলাম বেশ
আনন্দে গিলে ফেললাম তারা।

জানি ওর চোখের তারায় কাঁপছে ছায়া
আমার রূপের ছবি; আমাকে আবিষ্কার করছে
ও পরতে পরতে, নতুনতায়, আমিও জানছি ওকে,
নিজেকে; অসামান্য মুদ্রায় নেচে উঠছে
বিহঙ্গ মন, নতুন আলোর নেশা,
উন্মত্ত পাখনায়।

টেবিল তো টেবিলই, এক গ্লাস মদ,
সেও মদই, গ্লাসটিও আলাদা কিছু নয়,
এবং রাখাও সেই টেবিলেই।
অথচ, আমি যেন মনগড়া, অলীক
মিথ্যারই সামিল প্রায়,
কল্পমায়া, রক্তের কুহকে।

বলি ওকে, যা শুনতে চায় ও;

Under One Small star

My apologies to chance for calling it necessity.
My apologies to necessity in case I'm mistaken.
Don't be angry, happiness, that I take you for my own.
May the dead forgive me that their memory's but a flicker.

My apologies to time for the quantity of world overlooked per second.
My apologies to an old love for treating a new one as the first.
Forgive me, far-off wars, for carrying my flowers home.
Forgive me, open wounds, for pricking my finger.

My apologies for the minuet record, to those calling out from the abyss.
My apologies to those in train stations for sleeping soundly at five in the morning.
Pardon me, hounded hope, for laughing sometimes.
Pardon me, deserts, for not rushing in with a spoonful of water.

And you, O hawk, the same bird for years in the same cage,
staring, motionless, always at the same spot,
absolve me even if you happen to be stuffed.
My apologies to the tree felled for four table legs.

My apologies to large questions for small answers.
Truth, do not pay me too much attention.
Solemnity, be magnanimous toward me.
Bear with me, O mystery of being, for pulling threads from your veil.

Soul, don't blame me that I've got you so seldom.
My apologies to everything that I can't be everywhere.
My apologies to all for not knowing how to be every man and woman.

I know that as long as I live nothing can excuse me,
since I am my own obstacle.
Do not hold it against me, O speech, that I borrow weighty words,
and then labor to make them light.

(Translated from original polish by Stanislaw Baranczak and Clare Cavanagh)

ছোট্ট তারার নিচে

ক্ষমা চাই দৈব তোমার কাছে,
তোমাকে প্রয়োজন ভেবে নিই বলে ।
প্রয়োজন, ক্ষমা করো, যদি ভুল চেয়ে থাকি ।
আনন্দ, রেগো না, তোমায় আপনার ভাবি বলে ।
তোমরা যারা মৃত,
ভুলেছি তোমাদেরও, ক্ষমা করো ।

অনুতাপ, সময়, তোমার কাছেও;
পাহাড় প্রমাণ মানুষ উপেক্ষিত হয়
প্রত্যেক মুহূর্তে ।
গত-প্রেম, দুঃখ পেও না,
নতুন প্রেমকে যদি
প্রথম প্রেম বলে ডাকি ।
ফেলে আসা সংগ্রাম, তোমার নিহিত
মূল্য মুছে গেছে এত অনায়াসে।
রক্তাক্ত ক্ষত, ক্ষমা করো আমার
বেপরোয়া চলা ।

আমার ক্ষমা ভিক্ষা ইতিহাসের কাছে –
গভীর অতল থেকে,
মুক্তিভুক, ডেকে গেছে যারা,
তাদের স্বপ্নের পাশে
দাঁড়াতে পারি নি আমি ।
যারা যাত্রি, স্টেশনের ব্যস্ততায় এখন,
আমার ক্লান্ত ঘুম, ভোর রাত্রের,
ক্ষমা কোরো ।
অতিরঞ্জিত আশা, আমায় ক্ষমা করো,
কখনো হেসেছি হয়তো, অক্ষম ভনিতায়।
মরুভুমি, তুমিও,
কখনো আসিনি তোমার তৃষ্ণার কাছে,
এক বিন্দু জলেরও
ভরসা সাজিয়ে ।

আর তুমি, ধুসর ঈগল পাখি!
একই খাঁচায় নিরবধি
কালের স্তব্ধতায় অনড় ।
তুমিও আমায় মুক্তি দাও –
আমার পাপের শূন্যতায় আমি একা,
তোমার কৃত্রিমতাও, আমার
নির্জীব আত্মার চেয়ে গাঢ় ।
যে গাছ কেটে, এল এই
টেবিলের পায়া, তাকে দুঃখিত
বলার সুযোগ কে দেবে আমায় ?

বিরাট প্রশ্নের কাছে ক্ষমা চাই,
ক্ষুদ্র উত্তরের জবাবদিহি আমার ।
চিরসত্য, উপেক্ষা করতে পার অনায়াসে ।
পবিত্রতা, তোমার করুণা আমায় দিও ।
সৃষ্টি রহস্য, তোমার উদ্বায়ী অস্তিত্বের
দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরি, কেন জানো ?
শূন্যতা এড়াতে চাই শুধু ,
আর কিছু না ।

আমার নিগুঢ় আত্মা, তোমাকে
এড়িয়ে থাকি, তাই দুষো না আমায়।
সকলের কাছে ক্ষমা চাই, যে আমি
তোমাদের সবার সাথে থাকতে পারি না
সব সময় । সকল মানুষ হয়ে বাঁচতে
পারি না রোজ ।

আমি জানি, যত দিন জীবন,
ক্ষমার অযোগ্য আমি,
কেউ বাঁচাতে পারবে না আমায়,
এই তীব্র ক্ষয়, আমিই আমার
সব চেয়ে বড় বাধা ।
আমার ওপর রাগ করো না
আমার ভাষা,
ভীষণ ভারী শব্দ খুঁজে, তারপর তাকে
সহজ প্রকাশের আলো দিতে চাই –
অসাধ্য প্রয়াসে....

The Three Oddest Words

When I pronounce the word Future,
the first syllable already belongs to the past.
When I pronounce the word Silence,
I destroy it.
When I pronounce the word Nothing,
I make something no nonbeing can hold.

(Translated from original polish by
Stanislaw Baranczak and Clare Cavanagh)

তিনটে অদ্ভুত শব্দ

"ভবিষ্যৎ"
কথাটা উচ্চারণের শুরুতেই তো
প্রথম অংশ অতীত হয়ে যায় !

"নিঃশব্দ"...
বললেই খান খান হয়
নিস্তব্ধ প্রহর,
খুন হয় শান্তির সময় ।

"কিছু না" বলি যখন আমি,
কিছু যেন তৈরি হয়ে যায়,
কায়িক...নিশ্চল...স্থির
ছুঁয়ে ফেলা যায় ।

First Love

They say
the first love's most important.
That's very romantic,
but not my experience.

Something was and wasn't there between us,
something went on and went away.
My hands never tremble
when I stumble on silly keepsakes
and a sheaf of letters tied with string
not even ribbon.
Our only meeting after years:
two chairs chatting
at a chilly table.

Other loves
still breathe deep inside me.
This one's too short of breath even to sigh.
Yet just exactly as it is,
it does what the others still can't manage:
unremembered,
not even seen in dreams,
it introduces me to death.

(Translated from original polish by Stanislaw
Baranczak and Clare Cavanagh)

প্রথম প্রেম

লোকে বলে
প্রথম প্রেম কেউ ভোলে না,
সেই সুখ আর পাওয়া যায় না।
আমার অভিজ্ঞতা যদিও অন্য রকম।

আমাদের মধ্যে ঠিক কি
ছিল বা ছিল না জানি না।
কিছু ছিল হয়তো,
নিস্তেজ ক্রমাঙ্কের পথে
ক্রমশ বুদ্বুদ হয়েছিল।

আমার হাত কই কাঁপে না তো!
অজান্তে চোখে পড়ে গেলে,
ধুলো ঝেড়ে রেখে দেওয়া,
নির্বোধ স্মৃতির স্তূপে –
হলদে সুতোয় বাঁধা
এক গোছা বিবর্ণ চিঠি;
একটা ফিতেও জোটে নি
বেচারাদের ভাগ্যে ।
যুগান্তে দেখা হয়েছিল আবার,
বহু কাল বাদে,
কথা বলেছিল দুটো চেয়ার,
ঠান্ডা টেবিলের দুপাশে...

অনান্য প্রেম,
তাদের গরম নিঃশ্বাস, এখনও
হলকার মত, বুকের চৌহদ্দি জ্বালায়।
এরই শ্বাস রুদ্ধ হল,
একটা দীর্ঘশ্বাসও প্রাপ্য হল না ।

অথচ, ঠিক এভাবেই,
যেমন তেমন হয়েও,
একটা কাজ করে গেল।
মনে না থেকে,
স্বপ্নেও ইশারাহীন তবু,

আমার পরিচয় সেই করালো,
মৃত্যুর উদাসীন বারান্দায়।
আমাকে সূর্যহীন ঘরে ঠেলে দিল,
প্রথম প্রেম আমার,
অন্তিম পরিচয়ে ।

Possibilities

I prefer movies.
I prefer cats.
I prefer the oaks along the Warta.
I prefer Dickens to Dostoyevsky.
I prefer myself liking people
to myself loving mankind.
I prefer keeping a needle and thread on hand, just in case.
I prefer the color green.
I prefer not to maintain
that reason is to blame for everything.
I prefer exceptions.
I prefer to leave early.

I prefer talking to doctors about something else.
I prefer the old fine-lined illustrations.
I prefer the absurdity of writing poems
to the absurdity of not writing poems.
I prefer, where love's concerned, nonspecific anniversaries
that can be celebrated every day.
I prefer moralists
who promise me nothing.
I prefer cunning kindness to the over-trustful kind.
I prefer the earth in civvies.
I prefer conquered to conquering countries.
I prefer having some reservations.
I prefer the hell of chaos to the hell of order.

I prefer Grimms' fairy tales to the newspapers' front pages.
I prefer leaves without flowers to flowers without leaves.
I prefer dogs with uncropped tails.
I prefer light eyes, since mine are dark.
I prefer desk drawers.
I prefer many things that I haven't mentioned here
to many things I've also left unsaid.
I prefer zeroes on the loose
to those lined up behind a cipher.
I prefer the time of insects to the time of stars.
I prefer to knock on wood.
I prefer not to ask how much longer and when.
I prefer keeping in mind even the possibility
that existence has its own reason for being.

Translated by S. Baranczak & C. Cavanagh

সম্ভাবনাগুলি

আমার পছন্দ সিনেমা
আমার পছন্দ বেড়ালছানা
আমার পছন্দ ওয়ারটা-র কিনার-ঘেঁষা ওক গাছের সারি
আমার পছন্দ ডিকেন্স, দস্তয়েভস্কির চেয়ে
আমার পছন্দ, ভালো লাগা মানুষ
সমগ্র মানবতাকে ভালবাসার চেয়ে।

আমার পছন্দ একটা ছুঁচ সুতো সঙ্গে রাখা, কখন দরকার হয়
আমার পছন্দ সবুজ রঙ
আমার পছন্দ, যুক্তিবুদ্ধিই যে যত নষ্টের গোড়া-
এই ধারণাই মন থেকে ঝেড়ে ফেলা।
আমার পছন্দ ব্যতিক্রম
আমার পছন্দ তাড়াতাড়ি বেরনো, অফিসের কাজ সেরে।

আমার পছন্দ ডাক্তারের সাথে আরও নানা বিষয় নিয়ে গল্প করা
আমার পছন্দ সাবেকি কায়দার লাইন-ড্রয়িঙের স্কেচ।
আমার পছন্দ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এই কবিতা লেখা
কবিতা না-লেখার অসঙ্গত অযৌক্তিকতার চেয়ে।

আমার পছন্দ প্রেমিক প্রেমিকা প্রতিদিন পালন করুন
অজস্র অনির্দিষ্ট খুশির বার্ষিকী।
আমার পছন্দ নীতিবাদী মানুষ
যারা কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না আমায়।
আমার পছন্দ বিচক্ষণ দয়ালু, অসন্দিগ্ধ অন্ধ বিশ্বাসীর চেয়ে
আমার পছন্দ পৃথিবী ভরে যাক অসামরিক মানুষের ভিড়ে
আমার পছন্দ বিজিত, ঢের বেশী, বিজেতার চেয়ে
আমার পছন্দ কিছু সম্বরণ থাক না, ভাবনার, আবেগের,
আমার পছন্দ বরং, নৈরাজ্যের নরক, নিয়মের শৃঙ্খলের চেয়ে।

আমার পছন্দ রূপকথা, সংবাদপত্রের অকুণ্ঠ মিথ্যার চেয়ে
আমার পছন্দ ফুলহীন পাতার বাহার, পাতাহীন ফুলের চেয়ে।
আমার পছন্দ লেজ-না-ছাঁটা কুকুর
আমার পছন্দ কটা চোখ, যেহেতু আমার নিজেরগুলো গাঢ় বাদামি
আমার পছন্দ টেবিলের ড্রয়ার।
আমার পছন্দ আরও অনেক কিছু যার কথা আমি লিখি নি এখানে
আরও অনেক কিছুর চেয়ে, যেগুলোরও কোন উল্লেখ আমি করি নি।

আমার পছন্দ দলছুট শূন্যের দল ঘুরে বেড়াক ইচ্ছে মত
লাভের অঙ্কের পেছনে লালায়িত মানুষের দীর্ঘ লাইন ছোট হয়ে আসুক।
আমার পছন্দ পোকামাকড়ের ব্যস্ত প্রহর, কালের অনাদি শূন্যতার চেয়ে
আমার পছন্দ কাঠে টোকা-মারা
আমার পছন্দ না, জিগ্যেস করি, কতটা সময় আরও বরাদ্দ আমার
আমার পছন্দ মনে রাখি যেন, হয়ত অস্তিত্ব
আপন প্রয়োজনেই বিদ্যমান, এও এক সম্ভাবনা।

সুত্রপঞ্জি

1. My Poetic Side Bio: https://mypoeticside.com/poets/wislawa-szymborska-poems
2. Nobel.org life sketch: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1996/press-release/
3. Authorscalender Bio: http://authorscalendar.info/szymbor.htm
4. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska
5. Poetry foundation: https://www.poetryfoundation.org/poets/wisaawa-szymborska
6. New York Times article after Wislawa's death: https://www.nytimes.com/2012/02/02/books/wislawa-szymborska-nobel-winning-polish-poet-dies-at-88.html?searchResultPosition=1
7. New York Times Book Review: Map, Collected and Last Poems: https://www.nytimes.com/2015/04/26/books/review/wislawa-szymborskas-map-collected-and-last-poems.html?searchResultPosition=2
8. New York Times article after Nobel announcement in 1996: https://www.nytimes.com/1996/10/04/arts/polish-poet-wins-nobel-prize.html?searchResultPosition=4

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

পুষ্পা সাক্সেনা (অনুবাদ সুজয় দত্ত)

উদাস রং

অন্যমনস্কভাবে মিনতির সামনে একটা ইমেলের প্রিন্টআউট ছুঁড়ে দিল নিশান্ত।

— 'কী এটা ?' জানতে চায় মিনতি।

— 'নিজেই দেখে নাও না', বলে গম্ভীরভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিশান্ত। তার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে চমকে গিয়ে ভাবতে থাকে মিনতি — খুব খারাপ কোনো খবর নয় তো ? নাহলে এরকম করার লোক তো নয় তার স্বামী। বিয়ের রাতেই সে মিনতিকে বলেছিল, 'আমরা সেই দিনই সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী হব যেদিন আমাদের মধ্যে কোনো গোপনীয়তার পর্দা থাকবে না'। শুধু মুখে বলা নয়, কাজেও করে দেখিয়েছিল। দাম্পত্যজীবনের সেই প্রথম রাতেই নববধূকে শুনিয়ে দিয়েছিল বিয়ের আগে নেহা নামের এক সুন্দরীর প্রেমে নিজের হাবুডুবু খাওয়ার গল্প। তারপর হাসতে হাসতে মিনতিকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এবার আপনারটা বলুন ম্যাডাম। কটা রোমিও ঘুরঘুর করত আপনার পেছনে ? আরে যাকে ভালবাসতে তার নামটা বলে ফেল — আমি কিচ্ছু মনে করব না। তোমার অতীত নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই।'

'আমার অতীত-টতীত কিছু নেই। আমি কিরকম বাড়ীতে বড় হয়েছি দেখেছ তো। ঐ বাড়ীতে রোমান্সের কোনো জায়গা আছে মনে হয় ?' ঠোঁট কামড়ে কোনোরকমে জবাব দিয়েছিল মিনতি।

'আশ্চর্য ! ঐ মধ্যবিত্ত পাড়ার ছোট্ট বাড়ীটাই তোমার সমস্ত জগৎ ছিল নাকি ? কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে কেউ জোটে-টোটে নি ?'

'জুটলে কি আর তোমার সঙ্গে বিয়ে হয় ?' স্ত্রীর এই জবাবে হা-হা করে প্রাণ খুলে হেসে তাকে দু-বাহুতে জড়িয়ে নিয়েছিল নিশান্ত।

সেদিন থেকে আজ অবধি তার সেই কথার কোনো নড়চড় হয়নি। কোনোরকম লুকোছাপার ব্যাপারই ছিলনা দুজনের মধ্যে। স্বামীর নামে আসা চিঠিপত্র খুলে পড়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল মিনতির। ওদের কারোর নামে কোনো চিঠি এলে অনেকসময়ই দুজনে একসঙ্গে খুলে মজা করে পড়ত। আর আজ সেই নিশান্ত একটা কথাও না বলে বেরিয়ে গেল ?

প্রিন্ট আউটের দিকে চোখ পড়তেই মিনতির মুখচোখ একদম ফ্যাকাশে। এ তো লিজার লেখা ! ''রোহিত আর নেই। গোমতীর তীরে মিনতির উপস্থিতিতে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হোক — এই ছিল তার শেষ ইচ্ছে। মিনতিকে তাই অনুরোধ, প্রয়াতর শেষ ইচ্ছা যেন অবশ্যই পূর্ণ করেন। শেষকৃত্য হবে ডিসেম্বরের ন-তারিখে বিকেল চারটেয়। মিনতির জন্য রোহিত একটি ছবি এঁকেছিল, লিজা সেটি সঙ্গে নিয়ে আসবে।''

নিঃশব্দে দুচোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে ওর। স্বতঃস্ফূর্তভাবে — কোনো কপটতা বা অভিনয় নেই তাতে। হঠাৎ চমক ভাঙল নিশান্তের রাগী-রাগী গলা শুনে, 'তোমার লখনউ যাবার প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। সকাল দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবে। তোমার বাড়ীতেও ফোন করে দিয়েছি, জয়ন্ত আসবে রিসিভ করতে।'

'নিশান্ত, এই রোহিত আসলে আমাদের পাড়ায় একটা —' চোখ মুছতে মুছতে বোঝাতে চায় মিনতি।

'থাকগে, এই মুহূর্তে কিছু জানবার-বোঝবার মুড নেই আমার। তুমি প্যাকিং-ট্যাকিং করোগে যাও।' বলে মিনতিকে আর কোনো বাক্যব্যয়ের সুযোগ না দিয়ে চলে গেল নিশান্ত।

কতক্ষণ বসে বসে চোখের জল ফেলেছিল, খেয়াল নেই ওর। ঝাপসা চোখে বারবার ভেসে উঠছিল রোহিতের হাসিখুশী চেহারাটা। ড্রাইভারের ডাকে সম্বিত ফিরল, 'সাহেব আপনাকে এয়ারপোর্ট নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ী পাঠিয়েছেন। ফ্লাইট অন্ টাইম আছে ম্যাডাম। আপনার ব্যাগটা নিয়ে যাই ?'

— 'সাহেব নিজে আসবেন না ?'

— 'ওঁর মিটিং আছে এখন, আসতে পারবেন না ম্যাডাম।' ড্রাইভার ভদ্রভাবে উত্তর দিল। কিন্তু মিনতি বেশ বুঝতে পারছে যে নিশান্ত ভেতরে ভেতরে খুবই আহত হয়েছে। ইসস্, তখন যদি মায়ের বারণ না শুনত — শুরুতেই নিশান্তকে বলে দিত সবকিছু।

বিয়ের পরদিন মিনতি যখন বাপের বাড়ী ছেড়ে চলে আসছে স্বামীর সঙ্গে, সেই বিদায়ের মুহূর্তে মা নিজের দিব্যি কেটে বলেছিলেন, 'দেখ মা মিনু, যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে। এখন রোহিতের নাম চিরকালের মতো ভুলে গেলেই তোর মঙ্গল। পুরুষদের অনেকসময় সন্দেহবাতিক-টাতিক থাকে। ভুলেও রোহিতের নাম কখনো মুখে আনবি না তো ? দিব্যি করে বল।'

প্লেনে বসে থাকতে থাকতে মিনতির মনে পুরনো স্মৃতি ভীড় করে আসে। রোহিত গর্গ। বাপ-মা-মরা ছেলেটা শুধুমাত্র নিজের চেষ্টা আর সংকল্পের জোরে ইউনিভার্সিটির কলাবিভাগে প্রোফেসর হতে পেরেছিল। চন্ডীগড় থেকে এসে মিনতিদের পাড়ায় বাসা বাঁধার পর আলাপ হতে না হতেই ও মায়ের স্নেহপাত্র হয়ে উঠেছিল। ওর প্রতি গভীর মমতা ছিল মায়ের মনে। বেচারা এক্কেবারে শিশুবয়স থেকেই মাতৃস্নেহ কাকে বলে জানেনা, তার ওপর অল্পবয়সেই বাবাকেও হারিয়েছে — এসব শুনে মায়ের হৃদয় বিগলিত হয়েছিল। মাঝেমাঝেই বাড়ীতে ডেকে ওকে ওর পছন্দের রান্নাগুলো খাওয়াতেন। জ্ঞান হওয়ার পর এই প্রথম মায়ের যত্ন পেয়ে রোহিতেরও প্রাণে খুশীর ছোঁয়া লেগেছিল, মিনতিদের বাড়ী এলেই ও কেমন যেন ছেলেমানুষ হয়ে যেত। চিত্রকলা ছাড়াও ছেলেটার গীটারের হাতটাও ছিল দারুণ। ওর ছোট্ট ফ্ল্যাটে সাজানো অসাধারণ সব ছবি দেখে লোকে ধন্য-ধন্য করত। ওর গীটারের মিঠে সুরে অনেকসময় পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙত। মা রোহিতকে একবার বললেন, 'আমার এই মীনুটাকেও একটু ওসব জিনিস শিখিয়ে-টিখিয়ে দিও তো বাবা। পরের ঘরে যাবে যখন, রূপ আর কদিন ? ঐ গুণেরই কদর পাবে ও। হাজার হলেও মেয়ে তো শেষমেষ পরেরই সম্পত্তি।'

'ছাড়ো তো মা ! আমার গুণবতী কলাবতী হওয়ারও দরকার নেই, পরের ঘরে যাওয়ারও দরকার নেই।' মিনতি তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল।

'আরে তুমি তো অলরেডি গুণের খনি মিনতি। তবে গীটার বা পেন্টিং শিখলে সেই গুণের তালিকাটা একটু বাড়ে — এই আর কী।' ওর দিকে সোজা তাকিয়ে বলেছিল রোহিত। সে-দৃষ্টিতে এমন কিছু একটা ছিল, মিনতির শরীর-মন হঠাৎ রোমাঞ্চিত।

মাত্র তিন বছরেই মিনতিদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়ে সকলের আস্থা আর বিশ্বাস অর্জন করে নিল ছেলেটা। রোহিতেরই ইচ্ছেয় গীটার শেখার পাশাপাশি মিনতি আর্টপেপারে স্কেচ করা শুরু করল। গোমতী নদীর প্রতি একটা অদ্ভূত টান ছিল ছেলেটার। ওর পাল্লায় পড়ে মিনতিরও গোমতীতে নৌকাবিহারের অভ্যেস তৈরী হল আস্তে আস্তে। দুজনের সন্ধ্যেগুলো প্রায়ই কাটতে লাগল গোমতীর তীরে বসে গল্প করে অথবা নৌকায়। রোহিতের সঙ্গে যেকোনো জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে মিনতির ওপর ওর বাড়ী থেকে কোনোরকম নিষেধাজ্ঞা ছিলনা। কেউ কক্ষণো ভাবেনি ওরা দুজন যুবক-যুবতী, বয়সের দোষে কোনোদিন উল্টোপাল্টা কিছু করে ফেলতে পারে। ভেতরে ভেতরে মিনতির রোহিত ছাড়া নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে হত। ওরা দুজনে ছিল একে অপরের পরিপূরক। কে জানে, হয়তো ওর বাবা-মা মনে মনে ওদের দুজনকে বিবাহবন্ধনে বেঁধেই ফেলেছিলেন, তাই ওদের এই ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে এত চুপচাপ থাকতেন।

শীতের ছুটিতে রোহিত যখন ওর ইউনিভার্সিটির কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে সাগরতীরের কোন এক রিসর্টে 'সী বীচ

আর্টক্যাম্প' আয়োজন করছিল, মিনতি জেদ ধরে বসল, 'আমি কোনোদিন কোনো সী বীচে যাইনি। আমিও যাব ক্যাম্পে।' ওর এই জেদ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল বাবা-মাকে — যুবতী মেয়েকে এভাবে একদল অচেনা লোকের সঙ্গে ক্যাম্পে ছাড়া ঠিক হবে ? কিন্তু রোহিত দৃঢ় গলায় ওঁদের ভয় ভাঙিয়ে দিয়ে বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমি যতক্ষণ আছি মিনতি সম্পূর্ণ নিরাপদে, নিরুপদ্রবে থাকবে। আমার ওপর আপনাদের যে বিশ্বাস, তা কি আমি কখনো ভাঙতে পারি ?' ছেলেটার এই আশ্বাসে ওঁদের সব সংশয় দূর হয়ে গেল, অনুমতি দিলেন মেয়েকে। হাজার হলেও রোহিত তো এখন আর এ-বাড়ীর অপরিচিত কেউ না।

সাগরের ভয়ংকর-সুন্দর রূপ মিনতিকে মোহিত করে দিয়েছিল। দূরাগত সব বিশাল বিশাল ঢেউ কেমন মাথা নীচু করে সমুদ্রতটের বুকে নিজেদের নিঃশর্তে সমর্পণ করে মিলিয়ে যায়। সেদিকে তাকিয়ে 'সমর্পণ' কথাটার যেন একটা নতুন মানে খুঁজে পায় ও। প্রথমদিন ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পের সব নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিয়ে আর প্রয়োজনীয় নির্দেশ-টির্দেশ দিয়ে মিনতির দিকে মুচকি হেসে এক অদ্ভূত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রোহিত। সে-দৃষ্টি মিনতিকে লজ্জায়-সংকোচে লাল করে দিয়েছিল। ছাত্রছাত্রীরা সব নিজের নিজের ক্যানভাসে তুলি বোলাতে ব্যস্ত থাকত, কিন্তু মিনতির তো অঢেল সময়। ঘড়ি ধরে খাওয়া-শোওয়া-জাগার অনুশাসনও নেই। সারাটা দিন অলসভাবে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আর রোহিতকে দেখে। মনের ক্যানভাসে নানারঙের স্বপ্ন আঁকা হয় ওর। ভোরের আলো ফোটার আগেই রোহিত তার ইজেল, ক্যানভাস আর রংতুলি নিয়ে বেরিয়ে যায়, বীচের নির্জন জায়গাটায় বসে বসে নিবিষ্ট হয়ে ক্যানভাসে তুলির আঁচড় দিতে থাকে। আর মিনতি ওর ঘুম ভাঙলে থার্মাসে চা ভরে নিয়ে ওর কাছে গিয়ে বসে। তুলি হাতে মগ্ন রোহিত আর তার পশ্চাদ্পটে সমুদ্র — আঃ, একেবারে স্বর্গীয় দৃশ্য।

এরকমই একদিন রোহিত বীচে সাতসকালে একা একা ছবি আঁকছিল। খেয়ালও করেনি সাগরতটের ভেজা বালিতে একজোড়া সুন্দর পা কখন থমকে গেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার ক্যানভাসের দিকে। কারণ ক্যানভাসে যে ছবিটা আধফোটা হয়ে রয়েছে, এমন ছবি সে কখনো দেখেনি। সেখানে সমুদ্র এক প্রেমোন্মত্ত যুবা — অসংখ্য ঢেউয়ের মধ্যে থেকে দুই পেশল বাহু ছড়িয়ে এক ধীরগতিতে বয়ে আসা নদীর তন্বী জলধারাকে আপন আলিঙ্গনপাশে বাঁধার অপেক্ষায় রয়েছে। লিজা ফার্নান্ডেজের, অর্থাৎ হঠাৎ থমকে দাঁড়ানো সেই তরুণীটির, কাছে সাগর আর নদীর প্রেমকাহিনী নতুন নয়। অনেক জায়গায় পড়েছে। কিন্তু ক্যানভাসের এই ছবিটা যেন সমস্ত কল্পনাকে ছাপিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ইজেলের পাশেই বড় পাথরটার ওপর চুপচাপ বসে দেখতে থাকে। নিজের আঁকায় মগ্ন শিল্পী খেয়ালই করেনি কাছেই একজন মুগ্ধ দর্শক বসে রয়েছে। লিজাও তার তন্ময়তা ভঙ্গ করতে চাইছিল না, কিন্তু একটু দূর থেকে ভেসে আসা এক নারীকণ্ঠে চমকে গেল।

'এবার তো খানিকক্ষণের জন্য তুলিগুলোকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে শিল্পীমশাই। দেখুন, গরম গরম চা আর স্যান্ডুইচ এসে গেছে।' হাতে চা-জলখাবার নিয়ে মিনতি এসে দাঁড়াল।

'থ্যাংক্স্। তুমি না থাকলে এই শিল্পীকে নির্ঘাৎ খিদের জ্বালায় শুকিয়ে মরতে হত।' বলতে বলতে রোহিতের চোখ গিয়ে পড়ল পাথরে বসা সেই সুন্দরী তরুণীটির ওপর।

'হ্যালো। আপনি ?'

'আমি লিজা। অনেকক্ষণ থেকে আপনার ব্রাশের জাদু দেখছি। এই আশ্চর্য ছবিটা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে সাগরের ঢেউয়ের মধ্যে থেকে সত্যিসত্যিই এরকম একজন সুদর্শন যুবক না উঠে এসে দাঁড়ায়।' লিজা হেসে জবাব দিল।

'থ্যাংক্স্ ফর ইয়োর কম্প্লিমেন্ট্স্। ওই আর কি, ছবি আঁকার খুব শখ তাই রংতুলি নিয়ে একটু আধটু নাড়াচাড়া করি। আসুন, এক কাপ চা হয়ে যাক তাহলে ? কী মিনু, আমাদের অতিথির জন্যও চা আছে তো তোমার ফ্লাস্কে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ভাগের চা-টা তো দিতেই পার।' মিনুর মুখে দুষ্টুমির হাসি।

'লিজা, এ হল মিনতি। আমার বান্ধবী, আমার প্রণয়িনী, আমার প্রেরণা – এক কথায় আমার সবকিছু। জেদ করে আমার সঙ্গে এসেছে যাতে আমাকে বিরক্ত করতে পারে।'

'ও, আমি তোমাকে বিরক্ত করি ! একটু আগেই বলছিলে না যে আমি না থাকলে তুমি খিদেয় শুকিয়ে মরতে ? বিরক্তির কারণই যদি হই, তাহলে আমাকে সঙ্গে আনার জন্য অত অনুমতি-টনুমতি চাইলে কেন ?' অভিমানের সুরে বলে ওঠে মিনু।

'আচ্ছা বাবা, মাফ চাইছি, ভুল হয়ে গেছে। আরে তোমাকে ছাড়া এই রোহিতের কোনো অস্তিত্ব আছে নাকি ? এসো, আগে লিজার সঙ্গে পরিচয়পর্বটা তো সেরে নাও।'

চা খেতে খেতে লিজা বলতে লাগল নিজের কথা। ও নরওয়ের একটা শহরে স্কুলটীচার। গত কয়েকবছর প্রত্যেক শীতে ভারতের এই সমুদ্রতটে বেড়াতে আসে। এই যে হিন্দী শিখেছে, সেও এখানে থেকে-থেকেই। চিত্রকলায় ওর দারুণ উৎসাহ। নরওয়ের বিভিন্ন জায়গায় যে চিত্রপ্রদর্শনী হয়, তার অনেকগুলোতেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশ নেয় ও। রোহিতের আজকের এই ছবিটা দেখে ও সত্যিই মুগ্ধ হয়েছে। এই শিল্পীর আরও ছবি দেখার সৌভাগ্য হবে কিনা, তাই ভাবছে।

'এখানে রোহিতের তো দু-চারখানার বেশী ছবি দেখতে পাবেন না। লখনউ আসুন আমাদের সঙ্গে, দেখবেন ওর ঘরের প্রতিটা দেওয়ালে ওর কত ছবি।' কিছু না ভেবেই আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে মিনু।

'থ্যাংক্স্ ফর দ্য ইনভিটেশন। আপাততঃ যদি আপত্তি না থাকে, ঐ দু-চারটে ছবিই কি দেখতে আসতে পারি ?' অনুমতি চায় লিজা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি সবসময়েই স্বাগত। এখান থেকে একটু দূরে সানশাইন মোটেলে আমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উঠেছি।' জানায় রোহিত।

'রোহিতের তো ভীড়ভাট্টা একদম পছন্দ নয়, তাই ও মোটেলে উঠবে ঠিক করেছিল।' মিনতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল। মোটেল শুনে আবার ওদের সম্বন্ধে নীচু ধারণা করে না বসে বিদেশী মেয়েটা।

'আসলে তা নয়, রোম্যান্সের জন্য একটু নিরিবিলি লাগে তো, তাই মোটেল বেছেছি। কী, ঠিক তো মিনু ?' মুখভরা দুষ্টুমির হাসিতে রোহিতকে আরো সুন্দর দেখায়। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে লিজা।

'ধ্যাৎ ! লোকের সামনে এই ধরণের ইয়ার্কি মারতে লজ্জা করে না তোমার ?' মিনু সংকোচমিশ্রিত রাগে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'আরে এখানে লোক কোথায় ? আছে তো শুধু লিজা। ওঁর দেশে আবার প্রেম-টেম লোকে লুকিয়ে চুরিয়ে করেনা। সকলের সামনে কিস্, মানে চুমু-টুমু খায় লোকে। কি লিজা, ঠিক বলিনি ?' রোহিতের মুখেচোখে মজা আর পরিহাস ঠিকরে বেরোচ্ছে।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এমনিতে অবশ্য আপনাদের দুজনকে দেখে বিবাহিত মনে হচ্ছেনা। তাইতো ?' একটু সংশয়ের সঙ্গেই জানতে চাইল লিজা।

'না, বিয়ে এখনো হয়নি, তবে তার জন্যই অপেক্ষা করছি।' মিনুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে উঠল রোহিত।

'বিয়ে হয়নি অথচ একসঙ্গে রয়েছেন ? আপনাদের দুই পরিবারের কোনোআপত্তি নেই ? আমি তো শুনেছিলাম ইন্ডিয়ায় ছেলেমেয়েদের এতটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়না।'

'ভুল শোনেননি। তবে মিনতি আর আমার সম্পর্কের শুদ্ধতা নিয়ে আমাদের পরিবার-পরিজনের কোনো সংশয়-সন্দেহ নেই।'

ইতিমধ্যে সকালের সূর্যকিরণের রক্তিম আভায় রঞ্জিত আকাশে আলো তীব্রতর হয়েছে। সেই আলো প্রবহমান তরঙ্গমালার মাথায় মাথায় ঠিকরে উঠছে। রোহিতের ছবি আঁকায় আপাততঃ ইতি, সে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে। সন্ধ্যেবেলা সময় পেলে আবার আসবে, এই বলে লিজাও বিদায় নেয়।

মোটেলে পৌঁছেই মিনতির প্রশ্নবাণ শুরু হল, 'ঐ মেয়েটার সামনে তো খুব ফ্লার্ট করছিলে দেখলাম। ওকে ইম্প্রেস করছিলে বুঝি ?'

'হুঁ, ঠিকই বুঝেছ। আসলে উজ্জ্বল গৌরবর্ণের প্রতি আমার চিরকালই একটু দুর্বলতা তো, তাই –' রোহিত গাম্ভীর্যের ভান করে।

'তাহলে যাও ওকেই বিয়ে কর। আমার সঙ্গে পড়ে থেকে লাভ কী ? আমি সারাজীবন খোঁটা শুনতে পারবনা যে আমার রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নয়।' মিনু চিমটি কাটার চেষ্টা করে।

'আরে বাবা, রেগে যাচ্ছ কেন ? তোমার এই শ্যামলা রঙে যে সমুদ্রের মতো একটা নোনতা সৌন্দর্য আছে, সেটা ওর ঐ সাদা চামড়ায় আছে ? তোমার রূপ দেখে তো স্বর্গের অপ্সরাও লজ্জা পাবে। ঠিক আছে, অপরাধ হয়েছে, এই কান মলছি।' রোহিতের কথায় এবার হেসে ফেলে মিনু।

সেই সন্ধ্যেবেলায় লিজার সঙ্গে দারুণ কাটল ওদের। রোহিতের প্রতিটা ছবি দেখেই মেয়েটা বিস্ময়বিভোর হয়ে যায়। ওর ক্যামেরায় রোহিতের ছবিগুলোর স্ন্যাপশট নিতে নিতে একসময় বলে উঠল, 'নরওয়েতে সামনের অক্টোবরে একটা আন্তর্জাতিক চিত্রপ্রদর্শনী হবে। তোমার আপত্তি না থাকলে এই ফোটোগুলো ওদের কাছে জমা দিই ? প্রদর্শনীতে নাম ঢুকিয়ে দিই তোমার ?'

'আমার আঁকা তোমার ভাল লেগেছে, এটা আমার খুশীর কারণ তো বটেই। কিন্তু সত্যিই কি এগুলো ঐ প্রদর্শনীতে দেওয়ার মতো ?'

'তুমি জাননা রোহিত তুমি কত বড় শিল্পী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার ছবি ওরা নির্বাচন করবেই।'

'থ্যাংক্স্ লিজা। আমি অলীক স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি না। আমি বিরাট শিল্পীটিল্পী নই। তাছাড়া নরওয়ে আসা যাওয়ার খরচ যোগানোর সাধ্য আমার নেই।' সামান্য উদাস শোনায় রোহিতের গলা।

'ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবেনা। যাদের ছবি বাছা হয়, তাদের আসাযাওয়া আর থাকাখাওয়ার সব দায়িত্ব আয়োজকদেরই।'

'বাঃ ! দারুণ ব্যাপার। তাই যদি হয়, তাহলে আমিও যাব কিন্তু। আমাকে নিয়ে যাবে তো, রোহিত ?' মিনু পাশ থেকে আব্দার করে।

'এখনই খেয়ালী পোলাও রাঁধতে বসে যাবেন না ম্যাডাম। তুমি তো জান, আমি বাজে স্বপ্ন দেখা পছন্দ করিনা।'

'দেখুন, এবার আপনাদের স্বপ্ন হয়তো সত্যিই হয়ে যাবে। আমার মন বলছে আমি ভুল ভাবছি না।' দৃঢ়স্বরে বলে ওঠে লিজা।

লিজার দেশে ফেরবার আগে ওর অনুরোধে সেই সাগর থেকে উঠে আসা সুদর্শন যুবকের ছবিটা শেষ করেছিল রোহিত। ওর সবকটা ছবির ফোটো ক্যামেরাবন্দী করে একসময় বিদায় নিল মেয়েটা। কিছুদিনের মধ্যেই লিজার অনুপস্থিতিতে কিঞ্চিৎ

ফাঁকাফাঁকা বোধ করতে লাগল মিনু। একবার বলল, 'মেয়েটা বিদেশী, কিন্তু কী মিষ্টি স্বভাব দেখ। কত অল্প সময়ে কিরকম আপন করে নিল আমাদের।'

'বাঃ ! আশ্চর্য ব্যাপার তো ! জীবনে এই প্রথম কোনো অন্য মেয়ের প্রশংসা শুনলাম তোমার মুখ থেকে।' রোহিত রাগাবার চেষ্টা করে ওকে।

'কেন, আমি অন্য কারুর প্রশংসা করিনা বুঝি ?' মিনু কপট রাগ দেখিয়ে বলে।

'একদম তাই। মনে আছে, তোমার বান্ধবী মোনা যখন আমার কাছে ছবি আঁকা শিখতে চাইল, তুমি ওর হাজারটা দোষ আর খামতির লিস্ট দিলে আমাকে। শেষমেষ বেচারাকে আসতেই দিলে না আমার কাছে। আমার একটা ভাবী স্টুডেন্ট হাতছাড়া হয়ে গেল। লোকসানটা কার হল বল ?' রোহিতের গলায় হাল্কা পরিহাস।

'ওটা তো এইজন্য যে মেয়েটার ছবি আঁকাটাকায় আদৌ কোনো আগ্রহ ছিল না। ও স্রেফ তোমাকে ইম্প্রেস করতে চাইছিল। তাছাড়া – তাছাড়া মোনা খুব একটা ভাল মেয়ে নয়।'

'আচ্ছা ! বেশ, মেনে নিলাম তোমার শ্যেনদৃষ্টি তারিফযোগ্য। ওর হাত থেকে বাঁচিয়ে তুমি আমার বিরাট উপকার করেছ। তা এই উপকারের প্রতিদান দিতে সারাজীবন আমায় কী করতে হবে ?' হাসতে হাসতে বলে ওঠে রোহিত। ওর হাসি দেখে হঠাৎ রেগে যায় মিনু, 'যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না।'

'এইরে, এরকম বলতে নেই। আমি তো তাহলে জ্যান্ত মারা পড়ব।'

'আঃ, রোহিত, তোমাকে কতবার বলেছি না মরবার কথা কক্ষণো মুখে আনবে না ? নাহলে কিন্তু –' চোখ ছলছল করে আসে মিনুর, গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

লখনউ-এর গতানুগতিক জীবনযাপনের মধ্যে মধ্যে লিজার সঙ্গে ফোনালাপ চলে মিনুর। কবে প্রদর্শনীর জন্য রোহিতের পেন্টিং নির্বাচিত হওয়ার খবর আসবে, তার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে ও। একদিন হঠাৎই এল সেই সুখবর। রোহিতকে বেছেছেন আয়োজকরা। লিজা আরও জানাল, রোহিতের অস্থায়ী ভিসা আর প্লেনের টিকিটের বন্দোবস্ত খুব তাড়াতাড়িই করা হবে। রোহিতের যাবার তোড়জোড় দেখতে দেখতে মিনুর মনের ভেতরটা একটা অদ্ভুত বেদনায় চিনচিন করে। রোহিত সান্ত্বনা দেয়, 'আরে, মন খারাপ করছ কেন ? মাসখানেকের তো মামলা। বিয়ের পর তোমাকে পুরো দুনিয়া ঘোরাব, দেখো। পাসপোর্ট-টাসপোর্ট সব তৈরী করে রাখবে।'

শুনে চোখে রঙীন স্বপ্ন ভাসে মিনুর। জোর করে মুখে হাসি এনে রোহিতকে স্টেশনে বিদায় দিয়ে আসে ও। যেদিন ফোনে রোহিত ওর আঁকা ছবি প্রদর্শনীতে প্রথম তিনটে পুরস্কারের একটা পেয়েছে এই সুখবর দিল, খুশীতে ভেসে গিয়ে ও সারা পাড়াকে মিষ্টি খাওয়াল, মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করে এল। কিন্তু রোহিতের ঝুলিতে আরও বড় একটা সুখবর ছিল, যেটা জানা গেল আরও কিছুদিন পর। রোহিতের আঁকা দেখে নরওয়ের সেই শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন আর্টস্ বিভাগের অধ্যক্ষ নাকি কতৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছেন যে ওকে ওখানে চাকরি দেওয়া হোক। কিন্তু ওর তো স্থায়ী ভিসা বা চাকরির ভিসা নেই, সেটা ছাড়া এই নিয়োগ সম্ভব নয়। লিজা ওকে পরামর্শ দিয়েছে এই সুবর্ণ সুযোগ কোনোভাবেই ছাড়া উচিত নয়। এই একটা সুযোগই রোহিতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। ওখানকার মাইনেকড়ি, সুযোগসুবিধা ওর জীবনের স্বপ্নপূরণে দারুণ সহায়ক হবে। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলে কিন্তু পছতাতে হবে, কারণ নরওয়েতে তো আর চাকরিপ্রার্থীর অভাব নেই। লিজা ভেবেচিন্তে একটা উপায় বার করেছে। ও যদি স্রেফ নাম-কা-ওয়াস্তে লিজাকে বিয়ে করে নেয়, এখুনি কিন্তু ও-দেশের স্থায়ী ভিসা পেয়ে যাবে। ভিসা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগপত্র পাওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওরা ডিভোর্স করে নেবে। কিন্তু এই পরামর্শ রোহিতকে উল্লসিত করার বদলে গভীর দোটানায় ফেলে দিল। একদিকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর স্বপ্নপূরণের হাতছানি, অন্যদিকে লিজাকে বিয়ে করার মতো একটা অসম্ভব প্রস্তাব যা মনে আনাই খুব

কঠিন। ও কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিল না। শেষে লিজার পরামর্শেই সিদ্ধান্তটা ও পুরোপুরি মিনুর ওপর ছেড়ে দিল। মিনু যদি এই অদ্ভুত বন্দোবস্তে রাজি না হয়, রোহিত খুব তাড়াতাড়িই লখনউ ফিরে আসবে। তবে এই পদ্ধতিটায় যে কাজ দেয় সেটা বোঝাতে লিজা ইতিমধ্যেই রোহিতকে এমন কিছু অভিবাসীর সঙ্গে আলাপ করিয়েছে যারা স্থায়ী ভিসা পাওয়ার জন্য নরওয়ের নাগরিক কোনো মেয়েকে বিয়ে করে ভিসা পাওয়ার ছ-মাস থেকে দেড় বছরের মধ্যেই আলাদা হয়ে গেছে। রোহিত মিনুকে বলল, 'আমার ওপর তোমার যদি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তাহলেই একমাত্র এই প্রস্তাবে সম্মতি দিও। তোমার মন যদি বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত থাকে, স্রেফ বলে দাও সেকথা। আমি পত্রপাঠ ফিরে যাব। তোমার অসম্মতি আমি খুশীমনেই মেনে নেব। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ, আমাদের দুই বাড়ীর কেউ যেন এসব ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে। এটা শুধু তোমার আর আমার ব্যাপার। তোমাকে আমি কতটা ভালবাসি তা তো আর মুখে বলতে হবেনা, তোমার হৃদয় সেটা জানে। এখানে এই চাকরিটা হয়ে গেলে তোমার স্বপ্নগুলোই বাস্তবায়িত হবে মিনু, এসব তোমার জন্যই। খুব ভাল করে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিও। তুমি যা বলবে সেটাই চূড়ান্ত।'

এইরকম একটা প্রস্তাবে 'হ্যাঁ' বলা ঠিক কতটা কঠিন তা বুঝতে হলে মেয়ে হয়ে জন্মাতে হবে, কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে হবে। তবু মিনতি এককথায় নাকচ করে দিল না পরিকল্পনাটা। আকাশ পাতাল ভাবতে বসল। 'না' বলার মানে নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলোকে জলাঞ্জলি দেওয়া বা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া। আর 'হ্যাঁ'-এর মানে ? একজন স্বল্পপরিচিত বিদেশিনীর হাত তার প্রিয়তমকে ছোঁয়ার অধিকার পাবে — সে যতই নাম-কা-ওয়াস্তে হোক আর অল্পদিনের জন্য হোক। ভাবতে ভাবতে বেশ কিছু বিনিদ্র রজনী কাটাল ও। শেষ অবধি ওর মনের সব আশংকাকে ছাপিয়ে জয়ী হল রোহিতের প্রতি ওর গভীর বিশ্বাস আর আস্থা। নিজের সম্মতি জানিয়ে দিল ও। আর তার সঙ্গে এটাও বলল যে রোহিত যদি বিশ্বাসঘাতকতা করার কথা স্বপ্নেও ভাবে তাহলে কিন্তু মিনুর মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে সে।

বিয়ে, ভিসা, চাকরির পর্ব মিটে গেল ভালয় ভালয়। রোহিত আর লিজার বিয়ের দিন একটা অসহনীয়, অবর্ণনীয় কষ্ট বুকের ভেতর থেকে কান্না হয়ে উথলে উঠতে চাইছিল মিনুর, তবু ও প্রাণপণে চেপে রাখল সেটাকে। কাউকে জানতে দিল না। কিন্তু তারপর সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, এমনকী বছরের পর বছর কেটে গেল। রোহিতের আর ফেরার নাম নেই। ওর ব্যস্ততা নাকি এতই বেড়ে গেছে যে আজকাল মিনু ফোন করলে ধরারও ফুরসত পায়না। লিজা ধরে। আর প্রতিবার একই কথা বলে — রোহিতের ওপর বড় বড় টিচিং অ্যাসাইনমেন্ট চাপিয়েছে ইউনিভার্সিটি, ওর এখন নাওয়াখাওয়ার সময় নেই। বোধহয় লিজা আর রোহিত কোনো নতুন জায়গায় গিয়ে উঠেছে এখন, তাই পুরনো ঠিকানায় পাঠানো মিনুর সব চিঠিগুলোও ফেরত চলে আসে। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে একদিন মাকে সব কথা খুলে বলল ও। শুনে তিনি প্রথমে দুঃখে আর সমবেদনায় চোখের জল ফেললেন, তারপর ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন, 'নাঃ, ঐ বিদেশিনীই ওকে জাদু করে দিয়েছে। ওকে কয়েদ করে রেখেছে। নাহলে রোহিতের মতো ছেলে কখনো এরকম করতে পারে ? তোর চিঠির উত্তর দেয় না, তোর ফোন অবধি ধরে না — তাহলে তুই শুধু শুধু ওর জন্য বাতি জ্বালিয়ে বসে থাকবি কেন ? ভুলে যা ওকে।'

রাতের পর রাত জেগে জেগে এমনিতেই কান্নাকাটি করত মেয়েটা। এবার রাত জেগে পড়াশোনা শুরু করল। এম এ-টা শেষ করে নিল। মা খালি ওর বিয়ের কথা বলেন, আর ও বলে — না, ও মানসিকভাবে তৈরী নয়। শেষে মা যখন একদিন হুমকি দিলেন ও রাজী না হলে উনি আর জলস্পর্শ করবেন না, তখন বাধ্য হয়ে মত দিল। নিশান্তের মতো যোগ্য, সমঝদার পাত্রের হাতে মেয়েকে সঁপে দিতে পেরে মা নিশ্চিন্ত। কিন্তু মেয়ে ? তার ভালবাসা রক্তাক্ত হয়েছে, তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও নতুন জীবনসঙ্গীর গলায় মালা দেবার সময় একটা কথাই বারবার মনে হচ্ছিল ওর — লোকটাকে প্রতারণা করছে ও।

যাইহোক, রোহিতের স্মৃতিকে নিজের মনের গভীরে গোপন রেখে নিশান্তের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করল মিনু। বিয়ের পর নিশান্ত তার বৌকে সুখে-সাচ্ছন্দ্যে হাসিতে-আনন্দে রেখেছিল, কোনোদিন কোনো অভিযোগ করার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু

মিনুর হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ওর মনের মধ্যে রোহিতের নাম বারবার পাক খেয়ে খেয়ে উঠত, আর ও তখন জোর করে সেটাকে অবদমিত করে বাইরে নির্বিকার থাকত। মাকে কথা দিয়ে এসেছে যে — অতীতকে ভুলে গিয়ে বর্তমানকে আঁকড়ে বাঁচবে।

কিন্তু আজ তো সেই অতীতের ওপর থেকে একটানে পর্দা উঠে গেল। নিশান্ত এখন কী ভাবছে কে জানে! এরপর জীবন কোন দিকে মোড় নেবে তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরী হল বোধহয়। লখনউ পৌঁছে বাড়ী যেতে যেতে মিনুর হৃদ্‌পিন্ডের গতি বাড়তে লাগল ক্রমশঃ — মাকে ফোনে নিশান্ত ঠিক কী বলেছে সেটা তো ও আর শুনে আসেনি। কেন ও হঠাৎ লখনউ এল, সেই কারণটা কি মা জানে?

না, দেখা গেল, মা জানতেন না। নিশান্ত কিছু বলেনি। মেয়ের কাছে সব শুনে উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন। 'ভুল করলি তুই। তোর একেবারেই আসা উচিত হয়নি। এভাবে একজনকে অতীতের কবর থেকে তুলে এনে নিজের বর্তমানের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এমন সর্বনাশটা তুই কেন করলি বলতো!'

'আমি কী করব বল? আমি কিছু করার আগেই তো নিশান্ত টিকিট-ফিকিট সব বুক করে ফেলল।' মিনু এবার কেঁদে ফেলে।

'আমার ভয় হচ্ছে রে — তোর এই একটা ভুলের জন্য শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে তোর সম্পর্কটাই না শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া কার শেষকৃত্যে এসেছিস বল তো? যে তোর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কাটিয়ে দিয়ে, তোকে চোখের জলে ভাসিয়ে বিদেশে ফুর্তি করে বেড়াল, তার প্রতি তোর কোনো কর্তব্য থাকতে পারে? আমি তোকে ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যেতে দেব না।' মায়ের গলাটা কঠিন শোনায়।

'না মা, তোমার পায়ে পড়ি, ওকথা বোল না। ওর শেষ ইচ্ছে আমাকে পূর্ণ করতেই হবে।' চোখের জল মুছতে মুছতে বলল মিনু।

'ঠিক আছে, আমার যা বলার বললাম। এবার কী করবি না করবি সেটা তোর ব্যাপার। আর এর ফলে ভাল-মন্দ যাই হোক না কেন তার জন্য দায়ী থাকবি তুই।' মা গজগজ করতে করতে চলে গেলেন।

সেই সন্ধ্যেয় গোমতী নদীর তীর ছিল কেমন এক বিষণ্ন শূন্যতায় ভরা। এই নদীই রোহিতের সঙ্গে যুবাবয়সের সেই সোনালী দিনগুলোয় কত জীবন্ত লাগত মিনতির। উদাস মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা লিজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে ওর। কফিনবন্দী রোহিতের চেহারাটা কল্পনা করে শিউরে ওঠে ও।

'আই অ্যাম সরি মিনু। তোমার রোহিতকে জীবিত অবস্থায় তোমার কাছে ফেরত আনতে পারলাম না।' এগিয়ে এসে মিনুর হাতদুটো ধরে শোকাচ্ছন্ন গলায় বলল লিজা।

'আমার রোহিত? কী বলছ? রোহিতকে তো আমি বহুবছর আগেই হারিয়েছি।'

'না মিনু না। তুমি জান না, রোহিত আজীবন তোমারই ছিল। ওর প্রেমে পড়ে আমিই বরং উচিত-অনুচিত ভুলে ওকে পাওয়ার একের পর এক ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছি। কিন্তু ও কোনোদিন আমার হয়নি। আর আজ তো ওকে চিরদিনের মতো হারালাম।' লিজার দুচোখ নীচু, দৃষ্টি নিবদ্ধ মাটিতে।

পন্ডিতমশাই মন্ত্রোচ্চারণ করে রোহিতের মৃতদেহ অগ্নিকে সমর্পণ করলেন। একা একা দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছিল মিনু। লিজা এগিয়ে এসে একটা বন্ধ খাম ধরিয়ে দিল ওর হাতে। বলল, 'খুব শান্ত মনে পড়ো এই চিঠিটা। কিছুদিন আগে রোহিত লিখেছিল এটা। আর তোমাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল আমায়। ওর আঁকা শেষ ছবিটা আমি হোটেলে রেখে এসেছি। ওটা তুমি হোটেলে এসে নিয়ে যাবে, না আমি তোমার বাড়ী পৌঁছে দেব? আজ যে তুমি এখানে এলে, এতে ওর আত্মা নিশ্চয়ই শান্তি পাবে। অনেক ধন্যবাদ আজ কষ্ট করে আসার জন্য।'

'আমার ছবি চাইনা। ওটা তুমিই রেখে দাও। ওর স্মৃতিজড়ানো কোনো জিনিসই আমি আর নিতে পারব না।'

'ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে ওটা আমি লখ্নৌয়ের আর্টস্ সেন্টারে দিয়ে যাব। কিন্তু ছবিটা একবার স্বচক্ষে দেখে নিও প্লীজ। এটা আমার অনুরোধ।'

'যা মন চায় তাই করছিস। নিজের সুখের ঘরসংসার ভেঙে যেচে সর্বনাশ ডেকে আনার এ কী খেলায় মেতেছিস বল তো?' মিনু ঘরে ফিরতেই মা ওকে নিয়ে পড়লেন। কোনো উত্তর না দিয়ে ও নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। হ্যাঁ, বিয়ের এতবছর পরেও এবাড়ীতে ওর ঘরটা ওর নামেই রাখা আছে। হাজার হোক বাবা-মার একমাত্র মেয়ে তো। কম্পিত বুকে লিজার দেওয়া খাম খুলে পড়তে শুরু করল ও –

''মিনু,

তোমাকে 'আমার মিনু' বলার অধিকার তো আমি এখন হারিয়েছি। একটা ভুলে পুরো জীবনটাই কেমন বদলে গেল। নিজেকে শাস্তি দিতে গিয়ে এটাই ভুলে গেছিলাম যে এর ফলে তুমিও কিছু কম অশান্তি ভোগ করবে না। তোমার সব ব্যথা, সব যন্ত্রণা আমি বুঝতে পারছি মিনু।

যেদিন আমার আঁকা ছবি প্রদর্শনীতে প্রথম তিনের মধ্যে বলে ঘোষিত হল, তোমার কথা এত মনে পড়ছিল যে কী বলব। আমার সব আনন্দ মনে মনে তোমাকেই সমর্পণ করছিলাম। আর ভাবছিলাম আজ এখানে থাকলে কী ভীষণ খুশী হতে তুমি। ইউনিভার্সিটির চাকরিটা পাওয়ার জন্য লিজার সঙ্গে চটজলদি বিয়েটা জরুরী ছিল। তোমাকে সারা দুনিয়া ঘোরানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা পূরণের একমাত্র উপায় একটা বিদেশী চাকরি। লিজা আমার ছবির পুরস্কার পাওয়ার আর আমাদের বিয়ের পার্টি একসঙ্গেই আয়োজন করেছিল। হৈহুল্লোড়ের সেই রাতে আমার অ্যালকোহল না ছোঁওয়ার চিরকালীন অভ্যেস বজায় রাখতে পারিনি। কতকটা জোর করেই আমার হাতে ড্রিংক্স্ ধরিয়ে দিয়েছিল ওরা। হায়, সেদিন যদি ওদের কথা না শুনতাম! সবাই আব্দার করল দুজনে মিলে এই জোড়া খুশখবর সেলিব্রেট করতে হবে। না জানি কত পেগ জোর করে খাইয়েছিল সেদিন আমায়। সাফল্যের ঘোর আর নেশার ঘোর মিলেমিশে আমি আর আমাতে ছিলাম না। সে-রাতে বিছানায় লিজার শরীর যখন আমার শরীরকে চাইল, আমি নেশার ঘোরে সে-ডাক প্রতিহত করতে পারলাম না – তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেললাম। তুমি বলেছিলে কখনো যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, তোমার মরা মুখ দেখব। একথা মনে পড়ার পর এই বিশ্বাসঘাতকের চেহারা নিয়ে তোমার সামনে কী করে দাঁড়াব, ভেবে পেলাম না। পরদিন সকালে নেশা ছুটে যাওয়ার পর ঘুম ভেঙে নিজের ওপর তীব্র ঘেন্না এল। মনে হল, আগের রাতেই তোমাকে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলেছি আমি। তখনই ঠিক করে নিলাম নিজেকে শাস্তি দেব – একাকিত্বের শাস্তি। লিজাকেও বললাম এই সিদ্ধান্তের কথা। কাগজেকলমে রয়ে গেলেও আমাদের নাম-কা-ওয়াস্তে বিয়ের ওখানেই পরিসমাপ্তি, আমি দূরে থাকতে চাই ওর থেকে। ওর জেদাজেদিতে ও-দেশের স্থয়ী ভিসা আর ইউনিভার্সিটির চাকরিটা নিয়ে রয়ে গেলাম ওই শহরেই, কিন্তু আলাদা আস্তানায়। খুব ইচ্ছে করছিল কাউকে না জানিয়ে কোনো একটা অজানা জায়গায় চলে যাই, সেখানে তোমার স্মৃতিটুকু নিয়ে বাঁচি। সেটা আর হল না। ভারতে ফেরার সাহস ছিলনা, কারণ ফিরলেই তো প্রথমে সেই লখনউ আর লখনউ মানেই তুমি। তোমাকে সামনে পেলে আমার এই কঠোর প্রতিজ্ঞা কি রাখতে পারতাম? দুর্বল হয়ে এই অপবিত্র শরীরেই তোমাকে ছুঁয়ে ফেলতাম। বিশ্বাস কর, লিজা আমার যত কাছে আসতে চাইত, আমি ওর থেকে ততই দূরে পালিয়ে যেতাম। আমিই ওকে অনুরোধ করেছিলাম তোমার ফোন-টোনগুলো যেন ও ধরে – আমার সাহস ছিলনা তোমার সঙ্গে কথা বলার। সবকিছু ভুলে থাকার জন্য সেই অ্যালকোহলের শরণাপন্ন হলাম, কিন্তু তাতেও বিশেষ লাভ হলনা। তখন থেকে আমার আঁকা সমস্ত ছবিতে এক বিষাক্ত, বিষণ্ন রং=ই শুধু থাকত। আমার মনের প্রতিফলন সেটা।

তোমার বিয়ের খবর যেদিন এল, রাতভর ঘুমোতে পারিনি। কিন্তু কী আর করা যাবে – দোষী তো আমিই। ইতিমধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপান শরীরে তার প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। ডাক্তার বলেছেন আমার লিভারের বেশ ভালরকম ক্ষতি হয়েছে। বলেছেন আমি নাকি আর বছরখানেকও বাঁচব না। উনি তো আর জানেন না, যেদিন আমি তোমার থেকে আলাদা হয়ে গেছি, সেদিনই আমার মৃত্যু হয়েছে। এই আমিই একসময় তরঙ্গোচ্ছল, সফেন সমুদ্রের মতো ছিলাম – এখন শীতল

বরফের মেরু হয়ে গেছি। কিন্তু আমাকে আর একটা ছবি অন্ততঃ আঁকতেই হবে। সেটা হবে তোমার বিয়েতে আমার উপহার। সেই ছবিতে আমি কিছুতেই বিষাদ-রং লাগাব না, উজ্জ্বল খুশীর রং থাকবে তাতে। সেই চেষ্টাই করেছি। দেখ কেমন হল। জানিনা আমার চেষ্টাসত্ত্বেও এই জ্বলেপুড়ে যাওয়া মনটার কালো-ধূসর-ছাইছাই রং ছবিটাকে সুন্দর হতে দিয়েছে কিনা। তুমি আর আমি যখন একসঙ্গে বাঁচতাম, আমার তখনকার ছবিগুলোর মত ভাল হয়তো এটা তোমার লাগবে না। তবু এটাই আমার শেষ ছবি — এই ভেবে যদি সামান্য মর্যাদা দাও। এছাড়া তো অন্য কোনো উপহারও দিতে পারব না তোমায়। মিনু, আমি তোমাকে দেওয়া কথা রাখতে না পারার অপরাধে অপরাধী। জানি আমি ক্ষমার যোগ্য নই, তবু পারবে কি ? পারবে কি আমায় ক্ষমা করতে ?

অনেক, অনেক ভাল থেক।

রোহিত

মিনুর চোখের জলে চিঠিটা ভিজে আবছা হয়ে গেছে। একরাতের একটা ভুলের এতবড় সাজা দিলে তুমি নিজেকে, রোহিত ? তুমি যদি একটিবার — একটিবার আমায় সত্যিকথাটা বলতে, পারতাম না আমি তোমায় ক্ষমা করতে ? এই তোমার বিশ্বাস আমার ওপর ? কটা পুরুষ তোমার মতো এত সুবিবেচক আর সংবেদনশীল হয় এই পথিবীতে ? তুমি কোনো সামান্য পুরুষ নও রোহিত — তুমি আমার এক এবং অদ্বিতীয় প্রণয়দেবতা।

রোহিতের এই সততা, সংবেদনশীলতা আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সঙ্গে জীবনে বহুবার পরিচয় হয়েছে মিনুর। কিন্তু ও নিজে ? এই পুরো ব্যাপারটার জন্য ওর নিজের কি কোনো দায় নেই ? ভুল কি শুধু রোহিতই করেছে ? নিজের ভবিষ্যৎ স্বপ্নপূরণ আর বিদেশ ঘোরার শখ এত বড় হয়ে উঠেছিল ওর কাছে যে নিজের প্রাণসখাকে, নিজের একমাত্র জীবনসঙ্গীকে এক আধো-চেনা নারীর হাতে তুলে দিতে হাত কাঁপল না ওর ? নাঃ, মিনু নিজেই নিজের সর্বনাশের কারণ। রোহিতকে ভুল বুঝে দূরে সরিয়ে রাখার আর কোনো পথই খোলা রইল না এ-চিঠি পড়ার পর। ওর ঐ শেষ পেন্টিংটা লিজার কাছ থেকে নিয়ে আসতেই হবে। চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায় ও।

দরজা খুলে ঘরের বাইরে আসতে ওকে দেখে চমকে গেলেন মা। ও ব্যাগ নিয়ে পোশাক আশাক পরে বেরোবার জন্য তৈরী। গলায় আক্রোশ ঝরে পড়ল তাঁর, 'আবার এখন কোথায় যাচ্ছিস ? আবার কোন ঘরপোড়ানি সর্বনাশী কাজ করার শখ জেগেছে মনে ?'

'লিজার কাছ থেকে আমার একটা জিনিস আনতে হবে।'

'তোর জিনিস ? না রোহিতের জিনিস ? দেখ মিনু, ছেলেমানুষী করিস না। ঐ অতীত হয়ে যাওয়া লোকটার কোনো চিহ্ন আর নিজের জীবনে বয়ে বেড়াস না। বিরাট ভুল হবে সেটা। নিশান্ত তোকে কিছুতেই ক্ষমা করবেনা। আজ যে মৃত, সে বেঁচে থাকতেই বা কী কম সর্বনাশটা করেছে তোর ? কেন এদভাবে জেনেবুঝে নিজের সাজানোগোছানো সংসারটা জ্বালিয়ে দিচ্ছিস ?'

'ভয় পেয়োনা মা। আমি নিশান্তকে খুব ভাল করে চিনি। ওর হৃদয়টা খুব বড়। ও আমাকে ঠিক ক্ষমা করে দেবে। বরং আমি যদি রোহিতের এই অন্তিম উপহারটা স্বীকার না করি, তাহলেই নিশান্ত অসন্তুষ্ট হতে পারে। রোহিতের শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করা ছাড়া আমার কোনো দ্বিতীয় রাস্তা নেই।'

মাকে বিস্ময়ে নির্বাক রেখে দ্রুত লিজার হোটেলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে মিনু।

সুজয় দত্ত — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

মৌসুমী রায়

বেনারসের ডায়রি

পর্ব ৪

(২০)

বারাণসীতে গঙ্গার ধার ঘেঁষে এক একটা ঘাটকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট বাজার মহল্লা গড়ে উঠেছে। রিভেরা প্যালেস থেকে বেরিয়ে টোটোতে মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম কেদার ঘাট। প্রথম দিন এসে এখান থেকেই কাশীর গঙ্গা দর্শন করি। আজ আবার আসা নৌকোয় ঘাট পরিদর্শন আর দশাশ্বমেধে সন্ধারতি দেখার আশায়। উঁচু থেকে সরু সিঁড়ি নেমে গেছে অনেক নীচে। ঘাটে প্রচুর মানুষের ভিড়। বেশ কয়েকজন দালাল চিৎকার করে নৌকোর দর হাঁকছে। গঙ্গার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সার সার রঙ বেরঙের নৌকো। সুনীল আর কীর্তি এগিয়ে গেল ওদিকটায়। আমরা তিন জন একটু দূরে দাঁড়িয়ে। জেটির এক ধারে একটা সিমেন্টে বাঁধানো বেশ বড়সড় গোল উঁচু চাতাল। চোখ পড়তেই যেন ভীষণ চেনা মনে হলো। যেন ঠিক ওখানেই ছদ্মবেশী জটাধারী লালমোহন বাবু তোপশেকে সঙ্গে নিয়ে বসে ফেলুদার অপেক্ষায় ! সামনে খোলা ইয়াব্বড়ো একটা রসগোল্লার হাঁড়ি ! মগনলাল মেঘরাজের বজরা এসে এই বুঝি ঘাট ছুঁয়ে দাঁড়াল ! কানে দূর থেকে ভেসে আসছে বেনারসী কাজরীর সুর। বজরা থেকে সুসজ্জিত ভেট পাত্র হাতে একে একে নেমে আসছে মগনলালের ভক্তের দল। সেই সুর অনুসরণ করে মছলিবাবার দরবারের দিকে সপারিষদ এগিয়ে চলেছে মগনলাল মেঘরাজ !

ওদিকে জোর তর্কাতর্কি চলছে। শ্রাবণের শেষ সোমবারের ঠিক আগের সন্ধ্যায় এই শেষ মওকা কামিয়ে নেওয়ার। তাই নো ছাড়াছাড়ি। আমি একটু

দূরে ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে বসলাম। পাশে দুই বয়স্ক ভদ্রলোক দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনায় মশগুল। মেয়ে আর রিয়াঙ্কা একটু দূরে দাঁড়িয়ে। পাশের রাজা হরিশ্চন্দ্র ঘাটে শব দাহ চলছে। দূর থেকে তার আগুনের হলুদ শিখা দুলে দুলে উঠছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম সেদিকে। মনটা কেমন যেন বিষন্ন আজ!

(২১)

বেশ কিছুক্ষণ দর কষাকষির পর একটা রফায় আশা গেল। যেটা দুপুরে ৪০/৫০ টাকায় ঘোরানোর জন্য ডাকাডাকি করছিল সেটাই এখন অনেক কথার শেষে ৩০০ টাকা। আজ না গেলে আর সুযোগ নেই বুঝে উঠেই পড়লাম নৌকোতে। দুলে উঠলো নৌকো। কোন মতে টাল সামলে গিয়ে বসলাম এক ধারে। মেয়ের হাতটা বেশ শক্ত করে ধরে রেখেছি। বুকটা একটু ঢিপঢিপ করে উঠলো। তবু 'জয় বাবা বিশ্বনাথের জয়' বলে জটায়ুর স্টাইলে নিজের মনেই একটু সাহস জোগালাম। কিছু বোঝার আগেই এক মহিলা ফুল আর প্রদীপে সাজানো আরতির ডালা এনে হাতে ধরিয়ে দিলো। দশ টাকার ছোট ছোট ডালা, দেখতে বেশ! তিন কন্যাকে তিনটে ধরিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে চটপট নেমে পড়লো নৌকো থেকে। ছটা বেজে গেছে। চারিদিক তখনও বেশ পরিষ্কার। নৌকো ছেড়ে দিলো। আরও কয়েকটি বাঙালি অবাঙালি পরিবারের সাথে চললাম ঘাট পরিদর্শনে। ঘন্টা খানেকের নৌকা বিহার। এই যাত্রায় বেয়াল্লিশটা ঘাটের সাথে আমাদের পরিচয় করানোর কথা।

(২২)

গঙ্গার টলটলে জলে নৌকো চলেছে হেলে দুলে। ভুটভুটি নৌকোয় একজন হাল ধরে এক দিকে বসে। একটি ছেলে চোস্ত হিন্দিতে একের পর এক ঘাটের বিবরণ দিয়ে চলেছে ঝড়ের গতিতে। খুব মন দিয়ে শুনেও গুলিয়ে ফেলছি কোনটা কোন রাজা বা রাণীর তৈরি ঘাট বা তার পেছনের ইতিহাস। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, ছোটবেলায় ইতিহাস তেমন না

টানলেও এই বয়সে এসে তা জানার আগ্রহ প্রবল। এক একটা ঘাট নির্মাণের ইতিহাস আর তার নির্মাণশৈলী একেক রকম। সন্ধের ঠিক আগে দিনের আলোয় গঙ্গাবক্ষ থেকে তার সৌন্দর্য মন ভরিয়ে দেয়। দূরে গঙ্গার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রামনগর ফোর্ট। জল থেকে দেখতে বেশ লাগছে। গঙ্গার বুকে কিছুটা যাবার পর ক্রমশঃ দিনের আলো কমতে শুরু করেছে। আলো জ্বলে উঠেছে ঘাটে ঘাটে। রঙিন আলোয় সাজানো ঘাটের প্রতিবিম্ব জলে পড়ে সে এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি শুধু। মোবাইলে ছবি তুলে রাখার চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব। সুনীল আর কীর্তির চোখ DSLR এর লেন্সে। মনিকর্ণিকা ঘাটে আগুনের রক্তিম শিখা হাওয়ায় কেঁপে উঁচু হয়ে উঠছে। কথিত আছে এই পুণ্যঘাটের চিতার আগুন কখনও নেভেনা। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর জন্ম এই বারাণসীতেই। বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল মণিকর্ণিকা। সম্ভবত তাঁর স্মৃতিতেই তৈরি এই বিখ্যাত ঘাট। এছাড়া নামের সাথে সাযুজ্য রেখে কিছু পৌরাণিক গল্পও জড়িয়ে আছে এই বিখ্যাত ঘাটের সঙ্গে। আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম বেশ খানিকটা। ললিত, অহল্যা, দ্বারভাঙা, অসি ঘাট একে একে পেরিয়ে চলেছি দশাশ্বমেধের উদ্দেশ্যে। অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি আলো ঝলমলে দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যারতির প্রস্তুতি চলছে। ঘাটের সামনে জলের কিছুটা অংশ ছেড়ে একে একে নৌকো এসে ভিড়ছে। গঙ্গাবক্ষে বসে সরাসরি আরতি দেখা এক অনন্য অভিজ্ঞতা! আমাদের নৌকোর সামনে ততক্ষণে বেশ ভিড় জমে গেছে।

(২৩)

ঘাটের কাছাকাছি আসতে হাতে ধরে রাখা ডালির প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দিলাম জলে । সেগুলো হেলতে দুলতে নৌকোর ফাঁক গলে চলে গেল চোখের আড়ালে। আরো অনেকেই তখন প্রদীপ ভাসাচ্ছে। গঙ্গার বুকে জোনাকির মত মিটমিট করে ভেসে বেড়াচ্ছে তারা। যেন আকাশের তারার দল নেমে এসে জলকেলি করছে। ওপরের পূর্ণিমার গোল চাঁদটাও যেন এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পাশে, হাত বাড়ালেই তাকে ছুঁয়ে ফেলতে পারবো এমন সুন্দর তার প্রতিবিম্ব। পাশে কিছুটা তফাতে দেখি মগনলালের বজরার ধাঁচে একটা সাদা বড় কাঁচে মোড়া দোতলা নৌকা। গাইড ছেলেটি জানালো, কদিন আগে মোদীজী এসে ওটির উদ্বোধন করে ওতে চড়ে বিভিন্ন ঘাট ঘুরে দেখেন। কিছুদিনের মধ্যেই ওটি তীর্থযাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। তবে দক্ষিণা যে কিঞ্চিৎ বেশি তা বলাই বাহুল্য।

নৌকো থেকেই শুনছি এক সমবেত জয়ধ্বনি বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে। মানুষ আবেগাপ্লুত। নৌকোতে রীতিমতো ঠেলাঠেলি চলছে। এই বুঝি নৌকো উল্টে গেল ! পুণ্যের এক অংশও কেউ ছাড়তে রাজি নয়। মানুষের ভক্তি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। আমরা এতটাই পেছনে যে নৌকোর সিটের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে হচ্ছে। গেরুয়া বসন সুঠাম দেহের পাঁচ ব্রাহ্মণ পূজারী একত্রিত হয়ে আরতি শুরু করেছে। চামরের বাতাস, শঙ্খধ্বনি আর জ্বলন্ত প্রদীপের আলোয় এক অনন্য সুন্দর পরিবেশ ! সুস্পষ্ট উচ্চারণে স্তোত্র পাঠের সাথে সন্ধ্যালগ্নে চলছে গঙ্গাবরণ। সমগ্র মহাকাশও যেন আবিষ্ট তখন সেই উৎসবের মাদকতায় .... !!

(চলবে)

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

ভীষণ অপরিচিত সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। হারিয়ে গেছে অনেক চেনা মুখ, পরিচিত অনেক কিছুই। তবু, জীবন মানে চরৈবেতি... The show must go on!.. আর তাই অসংখ্য পাঠক ও শ্রোতা বন্ধুদের উৎসাহে, তাঁদের সঙ্গে নিয়েই বাতায়ন, এই নব্য-স্বাভাবিক সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে গেছে, আয়োজন করেছে একের পর এক হৃদয়গ্রাহী অনলাইন অনুষ্ঠানের! তাতে সাড়া দিয়েছেন পৃথিবী জুড়ে অগণিত দর্শক, তাঁদের ভালোবাসায় ভরে উঠেছে বাতায়নের মন প্রাণ !

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সহযোগিতায় ছিলেন Bengali CineClub/ Australia, পত্রভারতী, socially distanced poetry slam/Australia.

(নিচের ও উপরের ছবিগুলিতে সেই সব অনুষ্ঠান আবার ফিরে দেখা)